182 Qc. 917 ৫০=50

182. Qc. 917.50

৪র্থ বর্ষ, [redacted],—

অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

চতুর্থ বর্ষ অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ অষ্টম সংখ্যা

সম্পাদক শ্রীসুকুমার রায়, বি, এস সি,

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা ।] [প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

The Sandesh is Printed and Illustrated by

U. RAY & SONS.

Process Engravers, Illustrators, Art Printers and Publishers.

100, GURPAR ROAD, CALCUTTA.

ছেলেমেয়েদের সুন্দর উপহারের বই

ছেলেদের রামায়ণ

(স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত)

(সপ্তম সংস্করণ)

৬ বৎসরে এই পুস্তক ৩০০০০ বিক্রয় হইয়াছে ! ইহার নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। ইহাতে ৮ খানি সুন্দর হাফটোন ছবি ও একখানি রঙ্গিন ছবি আছে। সপ্তম সংস্করণের হাফটোন ছবিগুলি সমস্তই নূতন।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র ; ভি-পিতে ৷৶০ আনা।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও "সন্দেশ" কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

RARE BOOK

5v ~ 828

NATIONAL LIBRARY
No. Imp 4193
DATE 16/9/59
CALCUTTA

IMPERIAL LIBRARY

রাক্ষুসে মাকড়সা।

১৪২. ৭৫. 717. 50.

সন্দেশ

চতুর্থ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ | অষ্টম সংখ্যা

BENGAL LIBRARY · 1917 · WRITERS BUILDINGS

পড়ার হিসাব।

ফির্‌ল সবাই ইস্কুলেতে সাঙ্গ হ'ল ছুটি—
আবার চলে বই-বগলে সবাই গুটি গুটি।
পড়ার পরে কার কি রকম মনটি ছিল এবার
সময় এল এখন তারই হিসেব খানা দেবার।
কেউ পড়েছেন পড়ার পুঁথি কেউ পড়েছেন গল্প,
কেউ পড়েছেন হদ্দমতন কেউ পড়েছেন অল্প।
কেউ বা তেড়ে গড়গড়িয়ে মুখস্থ কয় ঝাড়া,
কেউ বা কেবল কাঁচুমাচু মোটে না দেয় সাড়া।
গুরুমশাই এসেই ক্লাশে বলেন, "ওরে গদাই
এবার কিছু পড়্‌লি? নাকি খেল্‌তি কেবল সদাই?"
গদাই ভয়ে চোক পাকিয়ে ঘাবড়ে গিয়ে শেষে
বল্লে, "এবার পড়ার ঠেলা বেজায় সর্ব্বনেশে—
মামার বাড়ি যেম্নি যাওয়া অম্নি গাছে চড়া
একেবারে অম্নি ধপাস পড়ার মত পড়া!"

IMPERIAL LIBRARY

শুক্রাচার্য্যের তপস্যা।

দেবতাদিগের গুরু ছিলেন বৃহস্পতি। কথায় বলে—"বুদ্ধিতে বৃহস্পতি," বৃহস্পতি বাস্তবিকই অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন। শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগের গুরু, তিনি নাকি ছিলেন বৃহস্পতির চেয়েও বেশী বুদ্ধিমান।

সেকালে দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে ক্রমাগত হারিয়া অসুরদল যখন নিস্তেজ হইয়া পড়িল তখন তাহারা শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া বলিল—"প্রভু! দেবতাদের সঙ্গে আমরা আর কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছিনা। তাঁহারা বড় বড় দৈত্য যোদ্ধাদের প্রায় সকলকেই মারিয়াছেন এখন আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, নতুবা আমরা পৃথিবী ছাড়িয়া পাতালে চলিয়া যাইব।"

ভৃগুমুনির পুত্র পরম জ্ঞানী শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"তোমাদের ভয় কি? পৃথিবীতে যত ভাল ঔষধ এবং মন্ত্র আছে তার সবই আমি জানি। সে গুলি যদি তোমাদের শিখাইয়া দেই তবে দেবতারা তোমাদের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।"

এ দিকে দেবতারাও ভাবিলেন যে শুক্রাচার্য্য যদি তাঁহার ঔষধ মন্ত্র সব অসুরদিগকে বলিয়া দেন তাহা হইলে ত আর উপায় নাই! অতএব তাহার পূর্ব্বেই কেন আমরা অসুরকুল শেষ করিয়া ফেলি না? দেবতারা তখনি যুদ্ধের ঘটা করিয়া দৈত্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বল অসুরেরা শুক্রাচার্য্যকে সম্মুখে রাখিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল দেবতাদিগকে গ্রাহ্যও করিল না। স্বয়ং শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগকে রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া দেবতারাও আর অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না।

উপস্থিত বিপদ কাটিয়া গেলে পর শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগকে বলিলেন, "একদিন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিনটাই তোমাদের ছিল। বলিরাজার যজ্ঞে বিষ্ণু বামন অবতার সাজিয়া তিন পা জমি দক্ষিণা চাহিয়া তিন পায়ে সমস্তই দখল করিয়া লইয়াছেন, আর বলিরাজাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। জম্ভাসুর, বিরোচন প্রভৃতি বড় বড় দৈত্য যোদ্ধা বিষ্ণুর হাতেই মারা গিয়াছে, এখন তোমরা অতি অল্প লোকই বাঁচিয়া রহিয়াছ। আমার মনে হয় দেবতাদের সহিত এখন আর বিবাদ করিয়া কাজ নাই—কিছুকাল তোমরা চুপ করিয়া থাক। আমি মহাদেবের তপস্যা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সঞ্জীবনী

বিদ্যালাভ করিব। তারপর তোমরা পুনরায় দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিও—তখন তোমাদের জয় নিশ্চিত।"

এই উপদেশ মত দৈত্যপতি প্রহ্লাদ দেবতাদিগের নিকটে গিয়া প্রস্তাব করিল—"আমরা দানবদল সকলেই অস্ত্র ছাড়িয়াছি, আমরা আর যুদ্ধ করিবনা। এখন হইতে জটা বাকল পরিয়া বনে গিয়া আমরা তপস্যা করিব।" দেবতারাও তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন উভয় পক্ষ অস্ত্র ছাড়িয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল।

ইহার পর শুক্রাচার্য্য মহাদেবের তপস্যায় বাহির হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে দৈত্যদিগকে বলিয়া গেলেন, "তোমরা এখন কিছুকাল আমার পিতার আশ্রমে গিয়া সাধু সন্ন্যাসীর মত থাক। আমি মহাদেবের তপস্যা করিয়া ফিরিয়া আসি।"

শুক্রাচার্য্য মহাদেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "প্রভু! দেবগুরু বৃহস্পতিরও অজ্ঞাত যে সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে অসুর পক্ষের জয়ের জন্য আমি সেই মন্ত্র জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে শিখাইয়া দিন।"

মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে, এমন মহামূল্য মন্ত্র শুক্রচার্য্য চাহিবা মাত্রই মহাদেব তাঁহাকে শিখাইয়া দিবেন—তাহাও কি হয়! তিনি বলিলেন—"একহাজার বৎসর একটিও কথা না বলিয়া এবং কেবল মাত্র ধূম পান করিয়া যদি আমার তপস্যা করিতে পার তাহা হইলে সঞ্জীবনী মন্ত্র তোমাকে শিখাইব।" মহাদেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শুক্রাচার্য্য সেইদিন হইতে এই গুরুতর তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ক্রমে এই তপস্যার কথা দেবতা দিগের কাণে পৌঁছাইল—তাঁহারা বিষম ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন অসুরেরা এখন সন্ধি করিয়া অস্ত্র ছাড়িয়াছে; এই সুযোগে শুক্রাচার্য্য ফিরিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে। তখনি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দেবতারা আবার অসুরদিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অসুরেরা যুদ্ধের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

তাহারা নিরুপায় হইয়া গুরুমাতা ভৃগুপত্নীর শরণ লইল। ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া বলিলেন—"বাছারা! তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।" দেবতারা কিন্তু তবুও অসুরদিগকে আক্রমণ করিতে ছাড়িলেন না।

ভৃগুপত্নী তখন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—"বটে! তোমাদের এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি অসুরদিগকে অভয় দিয়াছি তবুও তাহাদিগকে তোমরা বধ করিতেছ? আজ আমি তোমাদের দলপতি ইন্দ্রকেই মারিয়া ফেলিব।"—এই বলিয়া তিনি ইন্দ্রের দিকে

ছুটিলেন দেবসৈন্যের সাধ্য হইলনা যে তাঁহাকে বাধা দেয়। ভৃগুপত্নীর চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, তাঁহার তেজ দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দলপতির দুর্দ্দশা দেখিয়া সৈন্যগণ তাঁহাকে ফেলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়! তখন বিষ্ণু আসিয়া ইন্দ্রকে তাড়াতাড়ি তাঁহার নিজের শরীরের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন। তখন ভৃগুপত্নীর ক্রোধ ভীষণতর হইয়া বিষ্ণুর উপরে পড়িল। তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"আজ আর রক্ষা নাই! আমি সকলের সাক্ষাতে এখনি ইন্দ্র এবং বিষ্ণু দুজনকেই যোগ বলে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।"

এখন উপায়? বিষ্ণুর হাতে ছিল সুদর্শন চক্র, ইন্দ্র বলিলেন—"শীঘ্র সুদর্শন দিয়া উহার মাথা কাটিয়া ফেলুন।" স্ত্রীহত্যা করিতে হইবে ভাবিয়া বিষ্ণুর মনে ভারী দুঃখ হইল। কিন্তু তখন আর দুঃখ করিবার সময় নাই—তিনি চক্র দিয়া ভৃগুপত্নীর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া মহর্ষি ভৃগু ক্রোধে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিলেন—"এত বড় দেবতা হইয়া তুমি অবধ্য স্ত্রীলোককে হত্যা করিলে এই জন্য সাতবার তোমাকে মানুষ হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।"

ভৃগুমুনি তখন তাঁহার স্ত্রীর কাটা মাথাটি তুলিয়া লইয়া শরীরে লাগাইয়া তাহাতে জল ছিটাইয়া "দেবি, তুমি জীবিত হও" এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার পত্নী জীবিত হইলেন। তাঁহার এইরূপ আশ্চর্য্য তপস্যার বল দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ইহার পর ইন্দ্র দেবপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে আর শান্তি নাই। সমস্ত রাত্রি চিন্তায় কাটাইয়া পরের দিন ভোর বেলায় তিনি তাঁহার কন্যা জয়ন্তীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মা জয়ন্তী! দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী বিদ্যা পাইবার জন্য মহাদেবের তপস্যা করিতেছেন। ইহা পাইলে আমরা কিছুতেই অসুরদের সঙ্গে পারিয়া উঠিব না। তুমি গিয়া শুক্রাচার্য্যের সেবা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর।"

পিতার আদেশে জয়ন্তী যেখানে শুক্রাচার্য্য তপস্যা করিতেছিলেন সেখানে গিয়া দেখিলেন শুক্র অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছেন; তাঁহার শরীর শুকাইয়া গিয়াছে এবং মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। জয়ন্তী পরম ধৈর্য্যের সহিত বৎসরের পর বৎসর শুক্রের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। ক্রমে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। এইরূপে হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে শুক্রাচার্য্যের ধূমব্রত শেষ হইল। তখন মহাদেব আসিয়া শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন,—"একমাত্র তুমিই এই কঠোর তপস্যা করিতে

পারিলে, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি—তোমাকে আমি বর দিলাম।

বুদ্ধি, বল, তপস্যা এবং তোমার তেজ দ্বারা তুমি একাই দেবতাদিগকে জয় করিতে পারিবে। যে সঞ্জীবনী বিদ্যা পাইবার জন্য তুমি ব্যস্ত হইয়াছিলে তাহাও তোমাকে দিলাম। কিন্তু সঞ্জীবনী বিদ্যা তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" এই বলিয়া মহাদেব চলিয়া গেলেন।

মহাদেব চলিয়া গেলে পর শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কেন তুমি আমার দুঃখে কাতর হইয়া আমার সেবা করিতেছ? তোমার মিষ্ট ব্যবহারে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি—তুমি কি চাও বল, নিতান্ত কঠিন কাজ হইলেও আমি তাহা করিব।" জয়ন্তীর তখন ভারী লজ্জা বোধ হইল, এবং মাথা নীচু করিয়া শুক্রাচার্য্যের কথার শুধু এই উত্তর দিল,—"প্রভু! আপনি ত তপোবল দ্বারাই আমার মনের কথা জানিতে পারেন।"

শুক্রাচার্য্য যোগবলে জানিতে পারিলেন যে জয়ন্তীর ইচ্ছা সে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া দশ বৎসর তাঁহার সহিত সংসার বাস করে। শুক্রাচার্য্য তখন গৃহে ফিরিয়া গিয়া জয়ন্তীকে বিবাহ করিয়া দশ বৎসর কাল তাহার সহিত পরম সুখে সংসার করিতে

লাগিলেন। এই সময়ে তিনি যোগ বলে অদৃশ্য হইয়া রহিলেন কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে অসুরেরা যখন শুনিল যে গুরু শুক্রাচার্য্য মহাদেবের নিকট হইতে বর লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন তখন তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কিন্তু গুরু তখন মায়া বলে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন—কাজেই তাঁহাকে না পাইয়া তাহারা ফিরিয়া গেল।

শুক্রাচার্য্যের এই অদৃশ্য-বাসের সংবাদ পাইয়া দেবতাদিগের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি গজাইল। দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্যের রূপ ধরিয়া দৈত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"শিষ্যগণ! তোমরা সকলে আইস, মহাদেবের প্রসাদে আমি যে বিদ্যা লাভ করিয়াছি তাহা তোমাদিগকে শিখাইব।" দৈত্যদের তখন আনন্দ দেখে কে! সকলে মিলিয়া শুক্রবেশধারী বৃহস্পতির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে ক্রমে শুক্রাচার্য্যের যখন দশ বৎসর পূর্ণ হইল তখন তিনিও দৈত্যদের নিকটে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, কি সর্ব্বনাশ! বৃহস্পতি তাঁহার রূপ ধরিয়া দৈত্যদিগকে ঠকাইতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন,—"দৈত্যগণ! আমিই তোমাদের গুরু শুক্রাচার্য্য আর ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি—আমার রূপ ধরিয়া তোমাদিগকে ফাঁকি দিতেছেন, তোমরা ইঁহাকে ছাড়িয়া আমার নিকট চলিয়া আইস।"

দুইজনই দেখিতে ঠিক এক রকম; কে যে শুক্রাচার্য্য এবং কে যে বৃহস্পতি মূর্খ দৈত্যেরা তাহা কি করিয়া বুঝিবে! তাহারা দুই জনকেই বার বার দেখিতে লাগিল। বৃহস্পতিও ছাড়িবেন কেন? তিনিও জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দৈত্যগণ! আমিই তোমাদের গুরু শুক্রাচার্য্য, আর ইনিই দেবগুরু বৃহস্পতি—আমার রূপ ধরিয়া তোমাদিগকে ভুলাইতে আসিয়াছেন।"

তাঁহার কথা শুনিয়া অসুরেরা এক সঙ্গে মহা কোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ইনিই দশ বৎসর যাবৎ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, আমরাও ইঁহাকেই গুরু বলিয়া মানিয়াছি।" এই বলিয়া অসুরেরা বৃহস্পতির পায়ের ধূলা লইয়া আগন্তুক শুক্রাচার্য্যকে শাসাইয়া বলিল,—"ইনিই আমাদের গুরু, আমরা ইঁহার কথা মতনই কাজ করিব। তুমি কে হে বাপু? তোমাকে আমরা চাই না, শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও।"

এই অপমান শুক্রাচার্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দানবদিগকে অভিশাপ দিলেন—"ওরে দুষ্ট দানবগণ! তোদের মঙ্গলের জন্য এত করিলাম, এত বুঝাইলাম, তবু মূর্খেরা আমার কথা না শুনিয়া আমার অপমান করিলি। তোদের এই অপরাধে তোরা দেবতাদের নিকট পরাস্ত হইবি।" এই বলিয়া শুক্রাচার্য্য চলিয়া গেলেন।

বৃহস্পতি মনে মনে ভারী সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যই ছিল যাহাতে দানবেরা শুক্রাচার্য্যের বিদ্যা না শিখিতে পারে। এখন তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। আবার শুক্রাচার্য্য অভিশাপও দিয়াছেন—এখন দেবতাদের আর ভয় কিসের? এইরূপে দৈত্যদের সর্ব্বনাশ করিয়া তিনি নিজের রূপ ধরিয়া প্রস্থান করিলেন।

তখন অসুরেরা সবই বুঝিতে পারিল। তাদের মনের দুঃখে আর অনুতাপে তাহারা সকলে দলপতি প্রহ্লাদকে লইয়া শুক্রাচার্য্যের পায়ে লুটাইয়া পড়িল—কত যে কাঁদিল, কত যে অনুনয় বিনয় করিল! দৈত্যদের দুঃখ দেখিয়া শুক্রাচার্য্য গলিয়া গেলেন—তাঁহার রাগ দূর হইল। তিনি বলিলেন,—"দৈত্যগণ! আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, দেবতারা একবার তোমাদিগকে হারাইবেন তোমরাও কিছু দিনের জন্য পাতালে গিয়া আশ্রয় লইবে। কিন্তু আমার বিদ্যার বলে তোমরা আবার ফিরিয়া আসিবে এবং যুদ্ধে জয় লাভ করিবে।

শ্রীদুলদারঞ্জন রায়।

নিরেট গুরুর কাহিনী।

৪। ছিপ ফেলিয়া ঘোড়া ধরার গল্প।

আগের দিন গরমে খুব কষ্ট পাইতে হইয়াছিল বলিয়া, এবার শিষ্যেরা খুব ভোর বেলাতেই পোঁটলা পুঁটলি বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু এবারেও বেচারারা রক্ষা পাইল না। গুরুও হাঁটিয়া চলিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা খুব আস্তে আস্তে যাইতেছিল, কাজেই বেশী দূর যাইবার আগেই রোদ উঠিয়া পড়িল এবং গরমে তাহাদের কষ্ট হইতে লাগিল। কাছেই একটা বাগান দেখা যাইতেছিল, তাহারা সকলে সেইখানে গিয়া বসিল, এবং সকলে মিলিয়া বাতাস খাইয়া ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। এমন সময় বোকা ভাবিল, "আমি কেন এই বেলা স্নানটা সেরে নিই না? কাছে একটা পুকুরও ত আছে"।

সেই পুকুরের পাড়েই একটা মন্দির ছিল, আর মন্দিরের উঠানে একটা মস্ত বড় মাটির ঘোড়া দাঁড় করান ছিল। ঘোড়াটা বোধ হয় কেহ দেবতার নিকট মানত করিয়া থাকিবে, ইচ্ছা পূর্ণ হওয়াতে উঠানে রাখিয়া গিয়াছে। পুকুরটি জলে থই থই করিতেছিল, আর জলটা পরিষ্কারও খুব ছিল; কাজেই জলের মধ্যে ঘোড়াটার চমৎকার ছায়া পড়িয়াছিল। বোকা জলের মধ্যে একটা ঘোড়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, কিন্তু উপরের ঘোড়াটার দিকে চাহিয়া দেখিল যে সেটা এবং জলের ভিতরের ঘোড়াটা ঠিক এক রংয়ের এবং এক সমান, তখন তাহার মনে হইল যে, হয় ত জলের ভিতরের জিনিষটা আর একটা ঘোড়া নয়, উপরের ঘোড়ারই ছায়া।

এমন সময় একটু জোরে বাতাস বহাতে জলে ঢেউ উঠিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার ছায়াটাও নড়িতে লাগিল। বোকা তাড়াতাড়ি মাটীর ঘোড়াটার দিকে চাহিয়া দেখিল যে সেটা মোটেই নড়িতেছে না, আগের মত চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে, তখন তাহার স্থির বিশ্বাস হইল যে জলের ঘোড়াটা মাটীর ঘোড়া হইতে একেবারে আলাদা, এবং সেটা নিশ্চয় বাঁচিয়াও আছে, তাহা না হইলে নড়িবে চড়িবে কেমন করিয়া? তবুও একেবারে সব সন্দেহ দূর করিবার জন্য সে জলে একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিল। জলে ঢিল পড়িবামাত্র ছায়াটা খুব জোরে নড়িয়া উঠিল, বোকার মনে হইল যে, ঘোড়াটা মাথা তুলিয়া, পা ছুঁড়িয়া খুব জোরে লাফাইতে লাগিল। সে তখন ভয় পাইয়া ছুটিয়া গিয়া নিজের সঙ্গীদের খবর দিল।

শুনিবামাত্র বোকার সঙ্গীরা ছুটিয়া গিয়া পুকুরের ধারে উপস্থিত হইল। সব দেখিয়া শুনিয়া তাহারা বুঝিল যে বোকা ঠিক কথাই বলিয়াছে। জলের ঘোড়াটাকে কি রকম করিয়া ধরা যাইতে পারে ইহাই এখন ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কেহই জলে নামিয়া সেটাকে ধরিতে রাজি হইল না, নানা জনে নানা রকম উপায় বাহির করিতে লাগিল, কিন্তু কোনটার দ্বারাই কাজ উদ্ধার হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। শেষে ঠিক হইল যে ছিপ ফেলিয়া যেমন করিয়া মাছ ধরে, সেই রকম করিয়া ঘোড়াটাকে ধরিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে হইবে। ছিপে করিয়া ত ধরা হইবে, কিন্তু বঁড়শী কোথায় পাওয়া যায়? পাঁচ বুদ্ধিমানের মধ্যে একজন একখানা কাস্তে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, সেইখানাকেই বঁড়শী করা স্থির হইল। শুক্নর পাগড়ীতে কাস্তে বাঁধিয়া চমৎকার ছিপ তৈয়ারী হইল, টোপ হইল এক পোঁটলা ভাত, সেটাও এক শিষ্যের সম্পত্তি। যাক, এইবারে ছিপটি জলে ফেলা হইল, জিনিষটি বিশেষ হালকা

ছিল না, কাজেই খুব জোরে ঝপাৎ করিয়া গিয়া পুকুরে পড়িল। ঘোড়ার ছায়াটাও খুব জোরে নড়িয়া উঠিল। শিষ্যেরা দেখিল যে ঘোড়াটা ভয়ানক লাফাইতেছে এবং পা ছুঁড়িতেছে; তাহাদের ভয় হইল পাছে ঘোড়াটা লাফাইয়া বাহিরে আসিয়া তাহাদের দুই চার লাথি কসাইয়া দেয়। অতএব সকলে মিলিয়া সেখান হইতে দৌড় দিল। কেবল যে ছিপ ধরিয়াছিল সে পালাইল না, সেইখানেই বসিয়া রহিল। খানিক পরেই জলটা একটু স্থির হইল, তখন সকলে আবার আস্তে আস্তে আগাইয়া আসিতে লাগিল। এদিকে ভাতের পুঁটলীতে মস্ত এক মাছ আসিয়া কামড় দিয়াছে, ছিপে টান পড়িবা মাত্র যে ছিপ ধরিয়াছিল সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, দেখ, ঘোড়াটা টোপ গিলছে"। ইতিমধ্যে মাছটি পোঁটলা শুদ্ধ ভাত পার করিয়া বসিয়া আছে, আর কাস্তেখানি জলের

মধ্যের কতগুলি গাছ পালায় আট্‌কাইয়া গিয়াছে। ছিপ টানিয়া তুলিতে গিয়া তাহারা

"বঁড়শীটা একেবারে ঘোড়ার মুখে বিঁধে গিয়েছে, বাছা এইবার আমাদের হাতে এসেছেন"। ঘোড়াটাকে এইবার টানিয়া তুলিলেই হয়; সকলে মিলিয়া ছিপটাকে ধরিয়া খুব জোরে "হ্যাইও" করিয়া এক টান দিল আর সঙ্গে সঙ্গে পাগড়ী ছিঁড়িয়া সকলেই চিৎপাত! পাগড়ী বেচারার বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, একে গুরুমশায় তাহাকে অনেক বৎসর ধরিয়া মাথায় বাঁধিতেছিলেন, তার উপর পাঁচটি নাদুস্ নুদুস্ শিষ্যের টান।

ঐ সময় সেখান দিয়া একজন ভালমানুষ গোছের লোক যাইতেছিল। সে পুকুর পাড়ে পাঁচ জন লোককে গড়াগড়ি যাইতে দেখিয়া, কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তাহাদের কি হইয়াছে। শিষ্যেরা সকল কথা খুলিয়া বলিল। সে ব্যক্তি দেখিল যে ইহাদের বুদ্ধি কিছু বেশী, ইহাদিগকে আপনাদের ভুল বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। সে তখন একখানা কাপড় আনিয়া মাটীর ঘোড়াটাকে ঢাকিয়া দিল আর উহাদিগকে জলের ভিতর দেখিতে বলিল। জলের ঘোড়াটিকেও কাপড় ঢাকা দেখিয়া, তখন তাহারা ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিল। তখন তাহাদের মনে হইল যে এমন একজন ভাল লোক যখন পাওয়া গিয়াছে তখন তাহাকে আপনাদের সব সুখ দুঃখের কথা খুলিয়া বলা উচিত। লোকটিকে লইয়া গিয়া তাহারা প্রথমে গুরুকে দেখাইল। তারপর নিজেদের একটা ঘোড়ার দরকার, সেই জন্য অল্প দামে একটা ঘোড়ার ডিম কেনা, সেই ডিমটা নষ্ট হইয়া যাওয়া এবং ষাঁড় ভাড়া করা, প্রভৃতি যত ঘরের কথা ছিল কিছুই বলিতে বাকী রাখিল না। সে লোকটি দেখিল যে ইহারা ভাল মানুষ, যদিও ইহাদের বুদ্ধির কিছু অভাব আছে। বোকাদের প্রতি তাহার একটু দয়া হইল, সে বলিল, "আমার একটা খোঁড়া ঘোড়া আছে, সেটা বুড়োও হয়েছে কাজেই তাতে চড়তে কোনও ভয়ের কারণ নেই। টাকা কড়ি কিছুই দিতে হবে না, আমি ঘোড়াটা অমনিই তোমাদের দেব। তোমরা সকলে আমার বাড়ী এস।" এই বলিয়া সে সকলকে লইয়া নিজের বাড়ী চলিল।

(ক্রমশঃ)

"কালা"।

যার কথা বল্‌তে যাচ্ছি তার নাম "কালা"—সে কিন্তু মোরা দেশেরি জীব, একটি অষ্ট্রেলিয়ান ওয়েলার ঘোড়া। কালো সে বটে, একদম্ 'কালা আদমি'—কপালে দুধের রংএর একটি টিপ ছাড়া তার শরীরে কোথাও সাদার চিহ্ন মাত্র নাই। এ টিপ সহি করে তার দেশ-মা যেন তার জাতীয়ত্বের দলিল রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছেন, সে সনন্দ অপ্রমাণ করে আর কার সাধ্য। ঘোড়'টি দেখতে দিব্যি সুন্দর, কিছু সৌখীন, কিঞ্চিদধিক পরিমাণে খাম খেয়ালি! অভিজাত বংশীয় বলে তার বিশেষ অহঙ্কার আছে। কুলি মজুরের কালো কাপড়, মোট বইবার ঝুড়ি দেখলে একেবারে আঁতকে ওঠে। রাস্তায় তার নাকের পাশ দিয়ে হাওয়া গাড়ী ভোঁ ভোঁ করতে করতে গেলে, কিম্বা রাস্তা সারাবার এঞ্জিন গাড়ী যদি প্রবল শব্দে অত্যধিক ব্যস্ততার সহিত অনবরত যাওয়া আসা করে, তাহলেও এ বীর তুরঙ্গম কিছু মাত্র বিচলিত হয় না; কিন্তু ঝাঁকা মুটে বেচারী পাশ কাটিয়ে গেলেও, সে চমকে, ধমকে দাঁড়ায়; আর রাস্তার ধারে আঁচল-পাতা ভিখারিণীকে দেখলেত আর রক্ষা থাকে না, একেবারে মুখ ফিরিয়ে অন্য পথে যাবার জন্যে লম্ফ ঝম্প আরম্ভ করে। তখন তাকে অনেক দিলাসা দিতে হয়, বলতে হয় "গুড বয় গো অন্"—সহিস তার পিঠ চাপড়ায়, কোচম্যান বলে "চলো চলো"—আর মুনিব বলেন "আরে কালা কি দুষ্টামি করছিস্ শীগ্‌গির চল্"—অনেক স্তব স্তুতি এবং সেই সঙ্গে দুএকবার চাবুকেরও শব্দ হবার পর, স্থগিত যাত্রা আবার আরম্ভ হয়।

অভিজাত বংশীয় হলে কি হয়—কালার ক্ষুধা, নিবৃত্তি জানে না; ভোর ছয়টায় সে একবার দানা খায়, আর কিছু পূর্ব্ব হ'তেই চীৎকার আরম্ভ করে, "খাবার দাও", "খাবার দাও"। যখন দেখে দরওয়ান ভাঁড়ার খুলে সহিসকে দানা ওজন করে দিচ্ছে তখন সে আরো অস্থির হয়, চীৎকার করে, লাফায়, আবার এক এক দিন আস্তাবলের দরজার বাঁশ পা দিয়ে তুলে ফেলে, বাহিরে দৌড়ে আস্‌তে চায়। এর জন্যে তার শাসন যে হয় না তা নয়, তবে তাতে কোন ফল হয় না—আবার বেলা একটায় মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সেই একই অভিনয় চলে। 'কালা'র কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানও অল্প নেই, আপন খাবার খেয়ে আশ মেটে না, শোবার বিচালি পর্য্যন্ত শেষ করে। এটা ক্ষুধা নয়ত লোভ, এর আর অন্ত কোথায়, "যতই করিবে গ্রাস তত যাবে বেড়ে।" কালার

এটা স্বভাব-দোষ, সংশোধন হওয়া দুষ্কর—জানই ত কথায় বলে, "ইস্পত যায় ধুলে আর স্বভাব যায় ম'লে"—কালা ম'লে বড় অসুবিধা, লোভী হয়েই বেঁচে থাকুক কি করা যায় বল ?—কালা লোভী হলেও, তার আরও সদ্‌গুণ আছে। সে কুকুরের মত বাড়ী পাহারা দিতে জানে। অজানা লোক বাড়ীর ভিতর ঢুকলে, কিম্বা আস্তাবলের কাছে গেলে, সে চাঁহি চাঁহি সুরে এস্থি বাঁশরী বাজাতে আরম্ভ করে, যে, চাকর বাকর যে যেখানে আছে সবাইকে ঘরের বার ক'রে তবে সে ছাড়ে। অপরিচিত লোকটির সদ্‌গতি না করে কালা আর সুস্থির হয় না। তার চলন ভঙ্গীটি বড় সুন্দর, সে যখন ঘাড় বাঁকা করে, কাঁধের চুল নাচাতে নাচাতে, সমুদ্রের তরঙ্গের মত দুলতে দুলতে দৌড়ে যায়, তখন তাকে বড় চমৎকার দেখায়; যে দেখে সে বাহবা না দিয়ে থাকতে পারে না। কাজে তার আপত্তি নেই, যত দূরই নিয়ে যাও না খুসী মনেই যায়; তবে রাস্তা সম্বন্ধে বাচ বিচার আছে। কলিকাতার লাল রাস্তা আর গঙ্গা কিনারায় হাওয়া খাওয়াটাই তার পছন্দ সই—সহরের কাছাকাছি পাড়াগাঁয়ের মেঠো পথ, আর খেনো জমী, আদপেই তার মনে ধরেনা; সে দিকে যেতে হলে হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টায় থাকে—কিন্তু শেষ অবধি জিদ্ বজায় রাখতে পারে না, কি করে রাখবে বল, পরাধীন, ছাঁদন দড়ি বাঁধন দড়ি দিয়ে গাড়ীর গায়ে বাঁধা, সহিসের তম্বি; কোচম্যানের চাবুক; সবাই মিলে তাকে কাবু করে ফেলে; তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চালকের ইঙ্গিত মত ছুটে চলে। রাস্তার মধ্যে যদি কোথাও আটকান জল কিম্বা কলার পাতা কি বাস্‌না পড়ে থাকতে দেখে তবে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে; তার আকার প্রকার দেখলে বেশ বোঝা যায় ভারী ভয় পেয়েছে, সেখানে আর দাঁড়ায়না কি তাকায়না, একেবারে প্রাণপণ করে ছুটে চলে; কতক্ষণে এ বিভীষিকা এড়িয়ে যাবে, এই তার একান্ত চেষ্টা হয়। আর সে ভয় করে নিজের ছায়াকে, জ্যোৎস্না রাতে যখন সওয়ারিতে যায়, তখন সে এই আপন ছায়াকে দেখে আর অবাক হয়; কিছুই ঠাওর করতে পারেনা, এ সঙ্গী দাঁড়ালে দাঁড়ায়, ছুটলে আগ বাড়িয়ে যায়, কোন মতেই তাকে দূরে ফেলে যাবার যো নেই, যতই দৌড় দিক্ না বন্ধু সঙ্গে সঙ্গেই চলে, তবু তার কেমন ভয় হয়, হয়ত বা এ তার বন্ধু নয়; শত্রুই হবে বুঝি বা! সে যায় আর ফিরে ফিরে দেখে, আলোর দিক অনুসারে ছায়াও দিক্ পরিবর্ত্তন করে, আর এই অবোধ জীবটি দিশেহারা হয়ে পড়ে। সে তাই জ্যোৎস্নার চেয়ে অন্ধকারকেই পছন্দ করে বেশী, তখন এ নাছোড়বান্দা ছায়া তো সঙ্গে থাকেনা, "কালা" মনের আনন্দে চলে, নিজে

কালো; সে কালোকেই ভালবাসে, যেমন চোরে চোরে মাসতুত ভাই। আলোক তার জ্ঞাতি কুটুম্ব নয় তাই তাকে দূরে রাখে। পরকে আপন করা চতুষ্পদের কর্ম্ম নয়।

"কালা" বড় আদুরে, সকালে সওয়ারি দিতে তার মন সরে না, তিনি চান সন্ধ্যার ফুর ফুরে হাওয়াটি যখন দেবে, তখন কুল বাবুটির মত বেরোবেন। সকাল বেলায় ঘুম ভেঙে উঠে দিব্যি আরামে জিরিয়ে জিরিয়ে প্রাতরাশের সদ্ব্যবহার করবেন, ধীরে ধীরে দেহ হতে ঘুমের আলস্য ছুটবে, তারপর সহিসের হাত ধরে আহ্লাদে আলালের ঘরে দুলালের মত, দুল্‌তে দুল্‌তে বেড়াতে যাবেন, এই তাঁর মনগত অভিপ্রায়; কিন্তু কার্য্য-গতিকে যে দিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় সে দিন ভারী চটে যান। গাড়ী জুতবার সময় বার বার ফিরে ফিরে তাকায়, ভাবখানা, দেখত আমার "ভোরের চা রুটির তোস" সব পড়ে রইল আমায় কোথায় নিয়ে যায়?" তবে ফিরে এসে যখন মুখভরে আখ খেতে পায় তখন সে খুব খুসী হয়। "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এ কথা তো আমরা সবাই মানি, তা "কালা" কোন ছার?

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

রাক্ষুসে মাকড়সা।

ভাই সন্দেশ,

তুমি আশ্বিনের সংখ্যায় রাক্ষুসে কাঁকড়া আর নারকেল্-খেকো কাঁকড়ার কথা লিখেছ, তা পড়ে খুব আশ্চর্য্য বোধ হল।

উড়িষ্যায় আমার বাড়িতে, কাল যে কাঁকড়ার মাসতুত ভাই এক মাকড়সাকে দেখলাম সেও কম অদ্ভুত নয়। তার ছবি দেখলে আর তার বিষয় পড়লে তুমি নিশ্চয় আশ্চর্য্য হবে।

কাল রাত্রিতে আমার রাঁধুনি বামুন খাবার তৈয়ারি কত্তে বড়ই দেরী কল্লে। কারণটা কি বুঝবার জন্য রান্নাঘরে গেলাম। রান্না ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছি এমন সময়ে দেখলাম দরজার পাশে উপর থেকে একটা কি ধপ্ করে পড়ল। ল্যাণ্ঠন দিয়ে দেখলাম কাঁকড়ার মত প্রকাণ্ড একটা মাকড়সা একটা টিক্‌টিকি ধরেছে আর টিক্‌টিকিটে তার পেটের তলা থেকে ছট্‌কট্ কচ্ছে। খানিক পরেই, দেখতে দেখতে, টিকটিকিটার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। দেখলাম

মাকড়সাটা, বাঘের নখের মত বড় বাঁকা ও ধারাল, তার দাঁত দুটো টিকটিকির পিঠে

ফুটিয়ে দিয়ে রক্ত চুষে খাচ্ছে। রান্না ঘরে আগুন তুলবার একটা বড় লোহার চিম্‌টে চুলোর পাশে পড়ে ছিল, আমি সেই চিম্‌টে নিয়ে ধীরে ধীরে মাকড়সার কাছে এসে তাকে চিম্‌টে দিয়ে ধরে তুল্লাম। সে তার বড় বড় ঠ্যাং চারিদিকে ছুঁড়তে লাগল। আমি তাকে নিয়ে খুব বড় একটা কাঁচের চওড়া-মুখো বোতলের মধ্যে ফেলে দিয়ে বোতলের মুখ একখানা ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে মাকড়সাটাকে কয়েদ করে রাখলাম। আর তার চেহারা আর ভাবগতিক দেখতে লাগলাম। সে ভারি চটেছিল। চটে কর্ব্বেন কি, বাছাধন বন্দী! হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন এর পাঁচ যোড়া বা দশটা পা। তা কিন্তু নয়। মাথার সামনে প্রথম যোড়াটা দেখতে অন্য পাগুলোর মত হলেও সে দুটো গোঁফ বা শুঁয়োর কায করে। ফড়িং, আর্স্‌লো, প্রজাপতি প্রভৃতির যেমন এক যোড়া করে সরু শুঁয়ো থাকে, মাকড়সাদেরও তেমনি শুঁয়ো না থাকলেও এক যোড়া শুঁয়োর মত আছে, সে যোড়া সরু নয়, মোটা ও দেখতে ঠিক পায়ের মত। আর চার-যোড়া পা, সেই আটটা পা দিয়ে চলা ফেরা করে। প্রথম যোড়া দিয়ে ধ'রে বা স্পর্শ ক'রে দেখে তাই এ যোড়াকে "স্পর্শনি" বলে।

এ মাকড়সাটা কাঁচের বোতলের মসৃণ গা বেয়ে উঠতে লাগল। দেখলাম পিছনের তিন যোড়া পা দিয়েই উঠছে, আর প্রথম পা যোড়া ও শুঁড় যোড়া সামনের দিকে তুলে নাড়ছে যেন হাতড়ে হাতড়ে সব দেখছে। সাধারণ মাকড়সারা চার যোড়া পায়ে হাঁটে, এরা পিছনের তিন যোড়া পায়ে হাঁটে, প্রথম দুযোড়া স্পর্শনির কায করে। তারপর টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে টোকা মারলে যেমন ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হয়, বোতলের মধ্য থেকে সেই রকম শব্দ বেরুচ্ছে। মনে কল্লাম পায়ের আগায় নখ আছে তাই

দিয়ে বুঝি টোকা মাচ্ছে, অথবা দাঁতে ঘা মারছে। আলো দিয়ে বেশ করে দেখলাম, তাতে বুঝলাম ও রকমে শব্দ হচ্ছে না। পায়ের তলা নরম রোমে ঢাকা, তাতে নখ নাই, থাক্লেও এত ছোট ও সরু যে তা দিয়ে শব্দ হয় না। তারপর দেখলাম যখনই শুঁয়ো তুলে চোয়ালে ঘষে তখনই ঠক্ করে শব্দ হয়। চোয়ালের গায়ে ছোট ছোট কাঁটা আছে, স্পর্শনির শক্ত গোড়াটা তাতে বাধিয়ে টান্লেই ঐ রকম শব্দ হয়। শব্দ করে' বোধ 'ভয় দেখায়। পায়ের তলা এমন ভাবে গড়া যে খাড়া কাঁচের গা বেয়েও উঠতে পারে পিছলে পড়ে না। পিঁপ্ড়ে ও রকম উঠতে পারে না, মাছিতে পারে।

এর গলা নাই। মাথা ও বুক মিশে এক হয়ে গিয়েছে। পেট্টা বুক থেকে ভিন্ন আছে। শরীরটা দুভাগে বিভক্ত,—মাথাযুক্ত বুক আর পেট। সব মাকড়সার ঐ রকম। কাঁকড়ার মাথা-বুক-পেট সব যুড়ে এক হয়ে গিয়েছে। এর মুখের সামনে দুটো শক্ত চিবুলে আছে, সে দু'টো তার চোয়াল বা ঠোঁট। সেই ঠোঁটের আগায়, তলার দিকে বাঁকান, বিড়ালের নখের মত শক্ত, বাঁকা ও ছুচ্‌ল বিষ দাঁত আছে। সাপের বিষ দাঁতের মত এদের দাঁতেও ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়ে ঠোঁটের গোড়ায় বিষের থলি থেকে বিষ বেরিয়ে আসে। টিকটিকিটার পিঠে দাঁত ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দিয়েছিল বলে টিকটিকিটা নিস্তেজ হয়ে পড়ল আর তারপর মরে গেল। ছোট মাকড়সাদেরও ঐ রকম বিষ দাঁত আছে। তারা মাছি বা অন্য পোকা ধরে দাঁত বসিয়ে, বিষ ঢেলে মেরে ফেলে তারপর রক্ত চুষে খায়। এই ঠোঁট দুটাকে "দংশনোষ্ঠ" বলে। কাঁকড়ার সামনের দুটো পা তার শিকার ধরবার চোয়ালের অথবা হাতের কাষ করে, কিন্তু সে দুটা তাদের ঠোঁট নয়, আর তাদের বিষ দাঁতও নাই। মাকড়সার দুটো দাঁত মুখের মধ্যে নয়, আর তা দিয়ে খাবার চিবুনো বা ছেঁড়াও যায় না, সুতরাং এদুটো সত্যিকার দাঁত নয়। ঐ শিকার মারা কল, আর শিকার ধরে মুখের মধ্যে পুরে দেবার যন্ত্র। তা ছাড়া এ দিয়ে খাবার ধরে মুখের কাছে আনে।

এর পায়ে অনেকগুলি গাঁট বা পর্ব্ব বা পাঁপ্ আছে। প্রত্যেক পায়ে সব শুদ্ধ সাতটা পর্ব্ব আছে। কাকড়া ও ছিংড়ি,, পতঙ্গ ও তেঁতুলে বিছা আর কেন্নোর পাও এই রকম অনেক ভাগে বা পর্ব্বে বিভক্ত। সেই জন্য এই সব প্রাণীকে এক বিভাগে ভুক্ত করা হইয়াছে, এই বিভাগের প্রাণীদের নাম "পর্ব্বপদ" প্রাণী। কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি যে সব পর্ব্বপদ প্রাণীর দেহ শক্ত খোলায় ঢাকা তাদের এক শ্রেণীতে রাখা হয়েছে, তার নাম "খোলাকী"—ফড়িং, প্রজাপতি, বশা মাছি, বোল্‌তা পিঁপড়ে প্রভৃতি

যে সব পর্ব্বপদ প্রাণীর দেহ তিন ভাগে কাটা বা বিভক্ত, অর্থাৎ যাদের মাথা বুক আর পেট ভিন্ন দেখা যায় তাদের অন্য এক শ্রেণীতে রাখা হয়েছে। তাদের "খণ্ডিত-দেহী" বলে। ইংরাজিতে এদের in-sect বলে, তার অর্থ—"খণ্ডিত দেহ"। এদের সকলেরই বুক্ থেকে তিন যোড়া বা ছ'টা পা বেরোয় সেই জন্য এদের আমরা "ষটপদও" বলি। কেন্নো, তেঁতুলে বিছে প্রভৃতি প্রাণীর দেহ অনেক ভাগে বিভক্ত এবং তাদের অনেকগুলি পা থাকে, তাই তাদের অন্য এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে আর তার নাম দেওয়া হয়েছে—"বহুপদ"।

যে সব প্রাণী মাকড়সার মত আর যাদের মাথা আর বুক এক হয়ে গিয়েছে তাদের শ্রেণীর নাম "মাকড়সা শ্রেণী"। মাকড়সা, কাঁকড়াবিছা,—আর কুকুর ও ছাগলে গায়ে যে 'টিক্' পোকা বা এঁটুলি পোকা হয়—আর যে সব ক্ষুদে ক্ষুদে পোকা তোমার গায়ে বাসা করে তোমার খোস্ বা পাঁচড়া জন্মায়—তারা সব এই মাকড়সা শ্রেণী ভুক্ত। মাকড়সা in-sect নয়। যাদের মাথা, বুক ও পেট এই তিন ভাগ পৃথক ও স্পষ্ট ও যাদের ছ'টা ক'রে পা থাকে তারাই কেবল insect. মাকড়সাদের আটটা পা।

এই যে জাতের মাকড়সা ধরেছি তাদের রাক্ষুসে মাকড়সা বা বাঘা-মাকড়সা বলে। এরা অন্যান্য মাকড়সার মত জাল বুনে ফাঁদ পেতে শিকার ধরে না। বাঘের মত শিকারের পিছু পিছু নিঃশব্দে গিয়ে হঠাৎ তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে বিষ দাঁত ফুটিয়ে তাকে মেরে ফেলে। কয়েক জাতের ছোট ছোট মাকড়সা আছে তারাও ঐ রকমে মাছি ও অন্য ছোট ছোট পোকা শিকার করে। যারা এই রকমে শিকার ধরে তাদের শিকারী মাকড়সা বলে। অনেক জাতের মাকড়সা আছে তারা জাল বুনে ফাঁদ্ পেতে পোকা ধরে। তাদের মধ্যে কোন কোন জাত ঘরের মধ্যে দেয়ালের কোণে ও ছাদে জাল পাতে; কোন কোন জাত বাগানে গাছের ডালের মাঝে জাল পাতে; আবার কোন কোন জাত মাটিতে ঘাসের উপর জাল পাতে। জাল বোনার ধরণও সব জাতের সমান নয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মাকড়সা ভিন্ন ভিন্ন রকমের জাল তৈয়ার করে।

এই রাক্ষুসে মাকড়সার গা-ময় ঘন কোমল চিক্কণ লোমে ঢাকা, দেখ্‌তে মখ্‌মলের মত। রং কাল বা গাঢ় ধূসর। পা গুলিতে সাদা ও কাল ডোরা, দেখ্‌তে বেশ সুন্দর। মাথার উপরে মাঝখানে এক জায়গায় ছোট ছোট আটটি চোখ আছে।

এই জাতের রাক্ষুসে মাকড়সা ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয়, সুমিত্রা, যব ও গায়না দ্বীপ এবং অষ্ট্রেলিয়া দেশে বাস করে। ইহারা খোড়ো ঘরের চালে, পুরাতন বাড়ীর

দেয়ালের কাটলে, গাছের কোটরে, পাহাড়ের পাথরের ফাঁকে, ইঁট পাথর ও কাঠের গুঁড়ির তলায় বাস করে। ছবিতে দেখ, ইহার পিছন দিকে দু'টা উঁচু গোঁজের মত বাহির হইয়া রহিয়াছে, ও দু'টা ইহার সূতা-কাটা থলি। ঐ থলি হইতে সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে রস বাহির হইয়া জমিয়া সূতা হয়। সব মাকড়সার ঐ রকম সূতাকাটা থলি থাকে, সেই সূতায় জাল বুনে। ইহারা জাল না বুনিলেও সূতা অন্য কাযে লাগায়। ইহারা পেটের থলি হইতে সূতা বাহির করিয়া, ঘন করিয়া বুনিয়া রেসমের কাপড়ের মত তৈয়ার করে, সেই নরম কাপড় বাসায় পাতিয়া দিয়া আরামে বাস করে। স্ত্রী-মাকড়সা সূতা দিয়া ছোট্ট রেকাব বা বাটীর মত তৈয়ার করিয়া তাতে ডিম পাড়ে, পরে বাটীটার মুখ আর এক খানা কাপড়ের চাকৃতি দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। সেই কাপড়ের থলিয়ার ভিতর ডিমগুলি থাকে, পরে যথা সময়ে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। মা ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চাদের কাছে কাছে থাকে আর তাদের খাওয়ায়। বাচ্চারা বড় হলে নিজেরাই শিকার ধরে খায়। কখন মা আর তাদের খোঁজ খবরও লয় না, বরং পেলে ধরে খেতেও ছাড়ে না। বাচ্চারা বড় হতে থাকলে তাদের শরীরের চামড়াটা ফেটে যায়, তার তলে নূতন চামড়া গজায়, বাচ্চার শরীরটাও বড় হয়, আর পুরাণ চামড়াটা খসিয়া পড়ে। সাপে

ব্রেজিল দেশের পোষা 'রাক্ষুসে' মাকড়সা।

যেমন খোলস ছাড়ে, মাকড়সা, কাঁকড়া, চিংড়িও সেই রকম মাঝে মাঝে খোলস বদলায়, প্রত্যেক বারে শরীরটা পূর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। পূর্ণবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত মাকড়সা সাত আট বার খোলস বদলায়।

আমি যে মাকড়সাটা ধরিয়াছি সেটার পা ছড়াইয়া দিলে, একপা'র আগা থেকে অপর পাশের পা'র আগা পর্য্যন্ত ৭ইঞ্চ লম্বা—সন্দেশের পাতার চেয়েও বেশী চৌড়া-স্থান জুড়িয়া থাকে। এর মাথার আগা থেকে পেটের শেষ পর্য্যন্ত আড়াই ইঞ্চ। এক একটা এর চেয়েও বড় হয়। এদেরি মত অন্য জাতের রাক্ষুসে মাকড়সা আমেরিকায় ও আফ্রিকায় দেখা যায়।

ব্রাজিল দেশে একরকম "রাক্ষুসে" মাকড়সা আছে। সেগুলি নাকি এমন পোষমানে যে সে দেশের ছেলেমেয়েরা অনেক সময় তাদের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া এদিক ওদিক খেলাইয়া বেড়ায়। ঠিক যেন পোষা কুকুর।

ইহারা সাধারণতঃ আর্শ্বলা, গুবরে পোকা, ফড়িং প্রভৃতি নানা প্রকার কীট পতঙ্গ, ছোট ছোট টিক্‌টিকি, গিরগিটি, সাপের বাচ্চা ও ছোট ছোট পাখীর বাচ্চা ধরিয়া খায়। ছবিতে দেখ, রাক্ষুসে মাকড়সায় কেমন টিকটিকি আর পাখী ধরে খাচ্চে।

আগামী বারে তোমায় কাঁকড়া-বিছে আর তেঁতুলে বিছার কথা বল্‌ব। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার স্নেহ দাদামশায়।

চার বিদ্যে।

এক ছিল বুড়ো—সে বেচারা নেহাৎ গরীব—তার চারটী ছেলেকে নিয়ে খুব কষ্টেস্থষ্টে দিন কাটাত। একদিন সে তার ছেলেদের ডেকে বল্লে "দেখ বাবা আমি ত বুড়ো হয়েছি আর কদিনই বা বাঁচব; তা তোমরা এই বেলা কিছু কাজ কর্ম্ম শিখে নাও যাতে তোমাদের আর আমার মত কষ্ট পেতে না হয়"। এই কথা শুনে ছেলেরা ভাবলে "তাইত বাবা ত ঠিক কথাই বলেছেন, একটা কিছু কাজ কর্ম্ম শিখে নেওয়া যাক।" এই বলে তারা চারজন যার যা কিছু পুঁজি ছিল তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারা ক্রমাগতই চল্‌তে চল্‌তে, কত গ্রাম, কত বন পার হয়ে শেষে একটা চৌমাথা রাস্তায় এসে পড়ল। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, সমস্ত দিন রোদে ঘুরে ঘুরে তাদের

গা, হাত, পা সব ঝিম ঝিম করছে। তারা আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে সেই খানেই ধপ্ করে বসে পড়ল। কাছে একটা ভাঙ্গা প'ড়ো বাড়ী ছিল, তারা রাত্তিরটা সেই খানেই কাটাবে ঠিক কল্লে"। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে চারজনে পরামর্শ করলে যে "আমরা চারজনে চারটি রাস্তা ধরে যাব কিন্তু ঠিক চার বৎসর পরে আবার এইখানে এসে জড় হয়ে তারপর এক সঙ্গে বাড়ী যাব।" এই ঠিক ক'রে চার জনে চার দিকে চলে গেল। বড় ছেলেটী খানিকটা যেতে না যেতে দেখতে পেলে যে একটি লোক তাকে হাত বাড়িয়ে ডাক্‌ছে। সে তখুনি তার কাছে গেল। সেই লোকটি জিজ্ঞেস কল্লে "তুমি কোথা যাচ্ছ?" বড়ছেলেটি বল্লে,"আমি কিছু একটা কাজ টাজ শেখবার জন্যে বিদেশে যাচ্চি"। সে বল্লে তার আর ভাবনা কি? আমার কাছে থাক, আমি তোমাকে সেরা বিদ্যে শিখিয়ে দোব। ছেলেটি জিজ্ঞেস কল্লে,"সে কি রকম?" সে লোকটা বল্লে "সে হচ্ছে এমন বিদ্যে যে তুমি যে জিনিষটা মনে করবে সেই জিনিষটা আনতে পারবে অথচ কেউ টের পাবেনা।" বড় ছেলেটি তাইতেই রাজী হয়ে তার সঙ্গে থেকে গেল। এদিকে মেজ ছেলেটিও যেতে যেতে একটা বুড়ো লোকের দেখা পেলে। সে লোকটা বল্লে "তুমি আমার চেলা হও আমি তোমায় এমন বিদ্যে শেখাব যাতে তুমি পৃথিবীর সব জিনিষ দেখতে পাবে।" মেজ ছেলেটিও তখন তার চেলা হয়ে রইল। সেজ ছেলেটিও ঐ রকম এক শিকারীর পাল্লায় পড়ল। শিকারী বল্লে "আমি তোমায় অব্যর্থ শিকার বিদ্যে শেখাব"। সেজ ছেলেটি শিকার শিখতে লেগে গেল। ছোট ছেলেটি যেতে যেতে দেখতে পেলে, রাস্তার ধারে একটা দর্জ্জি বড় বড় ইঁট পাটকেল সেলাই কচ্ছে। ছেলেটাকে দেখেই সে বল্লে "তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমার কাছে থাকনা আমি তোমায় আশ্চর্য্য রকম দর্জ্জির কাজ শেখাব"। ছোট ছেলেটি তার কাছেই রয়ে গেল। চার বৎসরের মধ্যেই তারা চারজনে পাকা ওস্তাদ হ'য়ে চার বিদ্যে শিখে ফেল্লে। ততদিনে তাদের ফিরে আসবার সময় হয়ে এল। তখন বড় ছেলেটি তার ওস্তাদের কাছে সেরা বিদ্যের কলকায়দা সব আদায় ক'রে নিল। মেজ ছেলেটিও আসবার সময় সেই বুড়োর কাছ থেকে এক টুকরো কাঁচ নিয়ে এল, তা দিয়ে পৃথিবীর সব জিনিষ দেখতে পাওয়া যায়। সেজ ছেলেটিকে সেই শিকারি একটি তীর ধনুক দিয়ে বল্লে যে "তুমি যাকে লক্ষ্য করে মারবে সেই মরে যাবে।" এই রকম ছোট ছেলেটিরও আসবার সময় দর্জ্জিটা তাকে একটা ছুঁচ দিয়ে বল্লে "তুমি এই ছুঁচ দিয়ে যা সেলাই কর্ত্তে যাবে তাই সেলাই হয়ে যাবে"। এই রকমে চার ভাই যার যার মত কাজ শিখে সেই চৌমাথার কাছে এসে

হাজির হলো। তারপর তারা খুব আনন্দে নিজের নিজের বিদ্যের কথা বলতে বলতে বাড়ী ফিরে এল। তাদের বাবা যখন শুনলেন যে তারা চারজনে চার রকম বিদ্যে শিখে এসেছে তিনি তাদের বিদ্যে পরীক্ষা করবার জন্যে এক দিন তাদের একটা গাছতলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে মেজ ছেলেকে বল্লেন "আচ্ছা! তুমি কি রকম বিদ্যে শিখেছ দেখি। মাঠের ওপারে ঐ বড় গাছটার আগায় কি আছে বল দিখিনি"। সে অমনি কাঁচ দিয়ে দেখে বল্লে যে একটা ধাড়ী পাখী পাঁচটা ডিমের ওপর বসে তা' দিচ্ছে। তারপর তিনি বড় ছেলেকে বল্লেন, "তুমি কেমন বিদ্যে শিখেছ দেখি! ওই ডিমগুলোকে এমন ভাবে পেড়ে নিয়ে এস যেন ধাড়ী পাখীটা না টের পায়"। বড় ছেলেটি বলবামাত্রই অমনি দৌড়ে গিয়ে ডিম পেড়ে নিয়ে এল। তখন তিনি পাঁচটি ডিমকে আলাদা আলাদা করে রেখে সেজ ছেলেকে সেই ডিমগুলোকে এক বাণে দশ টুকরো কর্ত্তে বল্লেন। সেজ ছেলে অমনি ডিম পাঁচটিকে দশ টুকরো করে ফেল্লে। এই বার ছোট ছেলের পালা। তিনি ছোট ছেলেকে বল্লেন, "আচ্ছা! তুমি এইগুলো যেমন ছিল ঠিক তেমনি করে সেলাই কর দিখিনি।" ছোট ছেলে অমনি চটপট সব বেমালুম সেলাই করে ফেল্লে। তিনি তখন বড় ছেলেটিকে ডিমগুলো যেমন ছিল তেমনি ভাবে রেখে আস্তে বল্লেন। ধাড়ী পাখীটা ডিমে তা দিচ্ছিল কিন্তু সে এর কিছুই টের পেলেনা। তখন বুড়োর মুখে চার ছেলের প্রশংসা আর ধরে না।

এদিকে হয়েছে কি সে দেশের রাজকন্যাকে একটা রাক্ষস নিয়ে পালিয়ে গেছে। রাজা চারিদিকে ঢেরা পিটিয়ে দিয়েছেন, যে রাজকন্যাকে উদ্ধার কর্ত্তে পারবে সে রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব পাবে। এই কথা শুনে চার ভাইয়ে বলে উঠল আমরা রাজকন্যাকে উদ্ধার করব। মেজ ছেলেটি অমনি সেই কাঁচটা দিয়ে দেখে বল্লে, "সমুদ্রের ওপারে রাক্ষসটি রাজকন্যার কোলে মাথা রেখে খুব ঘুমোচ্ছে।" তারা তখনই নৌকা ক'রে সমুদ্র পার হ'য়ে সেইখানে হাজির হ'লো; তারপর বড় ভাইটি গিয়ে আস্তে আস্তে রাজকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে এল। কিন্তু যেই তারা নৌকায় উঠেছে, অমনি রাক্ষসটারও ঘুম ভেঙে গেছে। সে তখন আকাশ অন্ধকার ক'রে, হাতের কাপ্‌টায় ঝড় বইয়ে মেঘের উপর দিয়ে রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে যেই নৌকায় লাফ দিতে যাবে অমনি সেজ ভাইয়ের বাণের ঘায়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে ঝপাস ক'রে জলের মধ্যে এসি জোরে পড়ল, যে পাহাড়ের মতন ঢেউ উঠে এক বাড়িতে নৌকাটাকে মড়মড়িয়ে ভেঙ্গে ফেল্‌ল। এখন উপায় কি? ছোট ছেলেটা চটপট ছুঁচ চালিয়ে ভাঙা নৌকা

জুড়ে ফেল্‌লে। আর সবাই মিলে সেই নৌকাতেই নদী পার হ'য়ে রাজকন্যাকে নিয়ে একেবারে রাজার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। রাজা মশাইত মহা খুসী। রাজ্যের মধ্যে ধূমধাম পড়ে গেল। রাজা খুব টাকাকড়ি দান করতে লাগলেন। কিন্তু রাজকন্যাকে কে বিয়ে করবে এই নিয়ে একটা মহা গোলযোগ উপস্থিত হলো। চার ভায়ের সকলেই নিজের নিজের প্রশংসা কর্ত্তে লাগল। মেজ ছেলে বল্লে আমি যদি না দেখতুম তা হলে সন্ধান হ'ত কি ক'রে? বড় ছেলে বল্লে আমি যদি না আনতুম তা'হলে খবর পেয়েই বা কি লাভ হত? সেজ ছেলে বল্লে, "এনেছিলে ভালই, কিন্তু রাখতে কি পারতে? আমি যদি না রাক্ষসটাকে মারতুম তা'হলে ত সবই মাটি হত"। ছোট ছেলে বল্লে, "আমি যদি না নৌকা তৈরি কর্ত্তুম তা'হলে কাউকে আর ফিরে আসতে হত না। শেষ রক্ষা কর্‌লাম আমি"। রাজামশাই তখন খুব গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "বাপু সকল,

আমি তোমাদের গোলমাল মিটিয়ে দিচ্ছি। তোমরা কেউ রাজকন্যাকে বিয়ে কর্ত্তে পাবে না। অতএব আমার কথা মত আমি তোমাদের অর্দ্ধেক রাজত্ব দিচ্ছি তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও"। চার ভাইয়ে ভাবলে, তাই বা মন্দ কি অর্দ্ধেক রাজত্বও বড় কম কথা নয়! তখন তাদের বুড়ো বাপের আনন্দ দেখে কে?

শ্রীফণিভূষণ বসু।

ডাকঘরের কথা।

সন্দেশের ধাঁধার উত্তরের চিঠিগুলি সে দিন দেখছিলাম। কেউ আধ মাইল দূর থেকে লিখেছে চিঠি, কেউ লিখেছে ১৫০০ মাইল দূর থেকে—কিন্তু ১ পয়সার পোষ্ট কার্ডে প্রায় সকলেই লিখেছে। ১ পয়সা খরচে ১৫০০ মাইল চিঠি পাঠান, একি কম সস্তা হ'লো? হঠাৎ মনে হ'তে পারে অত কম মাশুলে এতদূর চিঠি পাঠাতে ডাকঘরের বুঝি লোকসান হয়;—কিন্তু তারা কি ২।১ খানা চিঠি পাঠায়?—প্রতিদিন লাখে লাখে চিঠি আর পার্শেল তারা পাঠায়;—তা'তেই তাদের খরচে পুষিয়ে যায়। ডাকঘরের বন্দোবস্তই বা কি কম আশ্চর্য্য রকম! তুমি হয় তো কল্‌কাতায় ব'সে একটা পোষ্ট কার্ডে চিঠি লিখে ডাক-বাক্সে সেটাকে ফেলে দিলে। কিছুক্ষণ পরে ডাকঘরের লোক এসে ডাক-বাক্সের চাবি খুলে চিঠিগুলো ডাকঘরে নিয়ে গেল। সেখানে অনেকগুলি লোকে মিলে চিঠির উপরে ডাকঘরের ছাপ মারে, আর এক একটা থলিতে এক একটা রেলে পাঠাবার চিঠিগুলি ভরে ফেলে—যেমন দার্জ্জিলিং মেলে, দার্জ্জিলিং, খরসান, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, কুচবেহার, এই সব জায়গার চিঠি; পাঞ্জাব মেলে, বর্দ্ধমান, মধুপুর, পাটনা, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর, এই সব জায়গার চিঠি। তারপর সব ছোট ডাকঘর থেকে বড় ডাকঘরে থ'লেগুলি পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে ষ্টেশনে চ'লে যায়। রেলের গাড়ীর মধ্যে আবার ডাকঘরের বন্দোবস্ত আছে। সেখানে থলিগুলো খুলে, প্রত্যেক জায়গাকার চিঠি আলাদা ক'রে এক একটা খোপে ভরে রাখে। তারপর সব চিঠি বাছা হয়ে গেলে, এক এক জায়গার চিঠি এক একটা আলগা থলিতে ভ'রে ফেলে। সেখানে যখন রেল পৌঁছায় তখন রেলের ডাকঘর থেকে সেই সেই জায়গার চিঠিগুলো নামিয়ে দেয়। তারপর

রেলের ডাকঘর।

আবার ডাকঘরে সেই থলি নিয়ে গিয়ে, তার থেকে চিঠি বের ক'রে, বেছে, পিয়ন দিয়ে

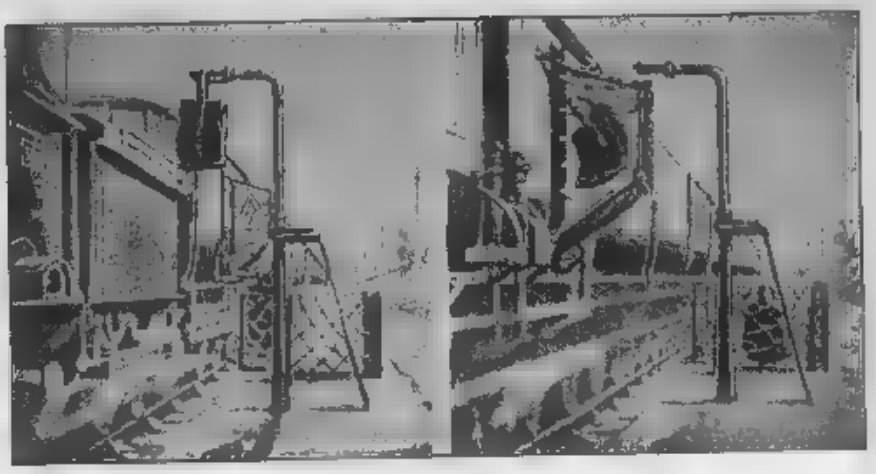

চলন্ত রেল থেকে ডাক দেওয়া আর নেওয়া।

বাড়ী বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এত হাঙ্গামার পরেও চিঠি যে ঠিকমত গিয়ে পৌঁছায়, এই আশ্চর্য্য—ক্বচিৎ ডাকঘরের কোন লোকের দোষে হারাতে পারে। পৃথিবীর যে-কোন জায়গার একজন লোকের ঠিকানা খুঁজে বের ক'রে তার ঠিকানায় একখানা চিঠি লিখে দাও; তারপর বাস্, তোমাকে আর ভাবতে হবে না—সেটা ঠিক সেই লোকের কাছে হাজির হবে।

সব সময়ই যে রেলে ডাক যায় তা' নয়। রেলে যায়, জাহাজে যায়, ছোট ষ্টিমারে যায়, নৌকায় যায়, গাড়ীতে যায়, মানুষের পিঠে যায়, কুকুরেটানা গাড়ীতে যায়—এমন কি এরোপ্লেনে ক'রে আকাশ দিয়েও যায়। এমন জায়গাও তো আছে যেখানে ডাকঘর নাই। সেখানের ঠিকানাতে চিঠি লিখলেও চিঠি ঠিকই পৌঁছায়। তবে সেখানে চিঠি যেতে কিছু দেরি লাগে। ইউরোপে যে সব সৈন্য যুদ্ধ করছে তাদের কাছেও চিঠি যাবার উপায় আছে। সে যেখানেই থাকুক না কেন, তার নাম, আর তার সৈন্য-দলের নাম, এইটুকু জান্‌লেই লড়াইএর ডাকঘরওয়ালারা ঠিক তার কাছে চিঠি কিম্বা পার্শেল পৌঁছে দেবে। আমাদের দেশে অনেক জায়গায় 'রাণার'এর ডাকের বন্দোবস্ত আছে। একজন লোক কাঁধে ক'রে চিঠির থলি নিয়ে এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাক-

ঘরে পৌঁছে দেয়। হাজারিবাগে আগে ঐ রকম বন্দোবস্ত ছিল। তখন অনেক 'রাণার' বাঘের মুখে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। অনেক সময় দুষ্টু লোকে, নির্জ্জন রাস্তায় পেয়ে 'রাণার'কে মেরে চিঠি-পত্র খুলে টাকা-কড়ি নিয়ে চ'লে যায়।

প্রায় ৭০ বৎসর আগে কোন দেশে টিকিট অথবা পোষ্টকার্ড ব্যবহারের নিয়ম ছিল না। তখন চিঠিপত্র পাঠাতে অত্যন্ত বেশী খরচ হ'তো। ইংলণ্ডের সার রোল্যাণ্ড হিল প্রথমে টিকিট ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। সে সময়ে চিঠির মাশুল এত বেশী ছিল, যে গরিব লোকের পক্ষে চিঠি পাওয়া বড় মুস্কিলের কথা ছিল। যার কাছে চিঠি যাবে তাকেই মাশুল দিতে হ'তো; আর অনেক সময় মাশুল দিতে না পারায়, অনেক গরিব লোককে দরকারী চিঠিও ফিরত দিতে হ'তো। লণ্ডন থেকে মাত্র ৪ মাইল দূরে একটা জায়গায় একটা চিঠি পাঠাতে ১৲ টাকারও বেশী খরচ হ'তো! পার্লামেণ্ট সভার সভ্যেরা বিনা পয়সায় চিঠি পাঠাতে পারতেন—চিঠির উপর তাঁর একটা নাম সই থাক্‌লেই হ'লো। তাঁরা অনেক সময় তাঁদের বন্ধুদের চিঠির উপরও সই করে দিতেন, আর বন্ধুরা সব বিনা পয়সায় চিঠি পাঠাতেন। কেবল চিঠি নয়, অনেক বড় বড় জিনিষও তারা ঐ রকম সই করে বিনা পয়সায় পাঠাতেন। গরিব লোকেরই বড় মুস্কিল হ'তো। তারা নিরুপায় হয়ে শেষে নানারকম ফাঁকি দিতে আরম্ভ করলো। একজন তার বোনকে বল্‌লো যে সে যখন তাকে চিঠি লিখ্‌বে, তার উপরের ঠিকানার পাশে কতকগুলি চিহ্ন থাকবে; সেই চিহ্ন দেখে বোঝা যাবে সে ভাল আছে, কি অসুস্থ হয়েছে। বোনও সেই রকম চিহ্ন দিয়ে তার ভাইকে চিঠি লিখ্‌ত। চিঠির ভিতরে কিন্তু কেবল সাদা কাগজ। চিঠি যখন পৌঁছাত, তখন তার উপরের চিহ্নগুলি দেখে নিয়ে তারা চিঠিটা ফেরত দিত আর বল্‌ত, "অত মাশুল দিয়ে চিঠি নেবার ক্ষমতা আমার নেই।" এই রকম আরও কত উপায়ে লোকেরা ডাক খরচ ঠকাতো।

রোল্যাণ্ড হিল যখন টিকেট ব্যবহারের প্রস্তাব করেন তখন বিলাতের পার্লামেণ্ট সভায় ভয়ানক আপত্তি হয়। কিন্তু অনেক খবরের কাগজওয়ালা তাঁর প্রস্তাবের স্বপক্ষে লেখেন আর সাধারণ লোকেও অনেক সভা সমিতি ক'রে তাঁর হয়ে বলেন। রোল্যাণ্ড ছিল ছেলেবেলায় গরিব লোক ছিলেন; তিনি গরীবের কষ্ট ভাল করে বুঝ্‌তেন আর তাদের জন্য খাটতেও সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর মনে ছিল, ছেলেবেলায় একদিন তাঁকে একটা চিঠির মাশুল জোগাড় করার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ছেঁড়া কাপড় বিক্রী

করতে হয়েছিল। তিনি চিঠি পাঠাবার খরচ সম্বন্ধে অনেক হিসাব ক'রে বল্‌লেন, "চিঠি পাঠাবার খরচ অত্যন্ত সামান্য; বেশী খরচ ডাকঘরেই হয়। আর অনেক চিঠি লোকে নেয় না ব'লে ডাক ঘরের বিস্তর টাকা লোকসান হয়। বড় লোকেরা তো বিনা পয়সায়ই অনেক চিঠি পাঠান। এর চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত হয়, যদি নিয়ম করা যায় যে চিঠি পাঠাবার আগে মাশুল দিতে হবে। আর মাশুল দেওয়া হয়েছে কিনা বুঝ্‌বার জন্য চিঠির উপর একটা টিকিট লাগিয়ে দিলেই হবে। কত মাশুল দেওয়া হ'লো তা' টিকিটেই লেখা থাক্‌বে।" অনেক আপত্তির পর পার্লামেণ্ট একবার এ উপায়টা পরীক্ষা কর্‌তে রাজি হলেন। রোল্যাণ্ডহিলের উপরেই সব বন্দোবস্তের ভার পড়ল। কয়েক বৎসর পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে এই ডাক টিকিটের বন্দোবস্ত এত সুবিধাজনক, যে এর বিরুদ্ধে আর কোন আপত্তিই টেকে না। তখন থেকে বিলাতে টিকিটের চল আরম্ভ হলো আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত পৃথিবীময় টিকিটের ব্যবহার আরম্ভ হ'লো। ডাকঘরের বন্দোবস্তও রোল্যাণ্ড হিলের বুদ্ধিতেই অনেকটা হয়েছে।

সার রোল্যাণ্ড হিল।

প্রথম ডাক টিকিট।

ছয় বীর।

সে প্রায় ছয়শত বৎসর আগেকার কথা—সে সময়ে ইংরাজ ও ফরাসিতে প্রায়ই যুদ্ধ চলিত। দুই পক্ষেই বড় বড় বীর ছিলেন—তাঁহাদের আশ্চর্য্য বীরত্বের কাহিনী ইউরোপের দেশ বিদেশে লোকে অবাক হইয়া শুনিত।

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ড তখন খুব বড় সৈন্যদল লইয়া ফ্রান্সে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ফ্রান্সের উত্তর দিকে সমুদ্রের উপকূলে ইংলণ্ডের খুব কাছাকাছি একটি সহর আছে, তাহার নাম 'ক্যালে' (Calais)। এই সহরটির উপর বহুকাল ধরিয়া

ইংরাজদের চোখ ছিল—কারণ এইটি দখল করিতে পারিলে ফ্রান্সে যাওয়া আসার খুবই সুবিধা হয়। এড্‌ওয়ার্ড জলস্থল দুই দিক হইতে এই সহরটিকে ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। ক্যালে' সহরে সৈন্য সামন্ত বেশী ছিল না, কিন্তু সেখানকার দুর্গ বড় ভয়ানক। তার চারিদিক উঁচু দেয়ালে ঘেরা—সেই দেয়ালের বাহিরে প্রকাণ্ড খাল—এক একটা ফটকের সামনে এক একটি পোল—সেই পোল দুর্গের ভিতর হইতে গুটাইয়া ফেলা যায়। সে সময়ে কামান ছিল বটে—তাহার গোলাতে মানুষ মরে কিন্তু দুর্গ ভাঙে না। সুতরাং জোর করিয়া দুর্গ দখল করা বড় সহজ ছিল না। কিন্তু এডওয়ার্ড তাহার জন্য ব্যস্ত হইলেন না—তিনি সহরের পথঘাট আটকাইয়া প্রকাণ্ড তাম্বু গাড়িয়া দিনের পর দিন নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মৎলবটি এই যে, যখন দুর্গের ভিতরের খাবার সব ফুরাইয়া আসিবে আর ভিতরের লোক জন ক্রমে কাহিল হইয়া পড়িবে, তখন তাহারা আপনা হইতেই হার মানিবে; মিছামিছি লড়াই হাঙ্গামা করিবার দরকার হইবে না।

ক্যালে'র লোকেরা যখন দেখিল ইংরাজেরা চারিদিক হইতে পথঘাট ঘিরিয়া ফেলিতেছে, তখন তাহারা শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম এবং দুর্ব্বল লোকদিগকে এবং স্ত্রীলোকদিগকে সহরে বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

তারপর কিছুদিন ধরিয়া ইংরাজ ও ফরাসিতে রেষারেষি চলিতে লাগিল। ফরাসিদের মৎলব বাহির হইতে দুর্গের ভিতরে খাবার পৌঁছাইবে—ইংরাজের চেষ্টা যে সেই খাবার কিছুতেই ভিতরে যাইতে দিবে না। ডাঙার পথে খাবার পৌঁছান একরূপ অসম্ভব ছিল—কারণ সে দিকে ইংরাজদের খুব কড়াকড় পাহারা। সমুদ্রের দিকেও ইংরাজদের যুদ্ধজাহাজ সর্ব্বদা ঘোরাঘুরি করিত কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তাহাদের এড়াইয়া ফরাসি নাবিকেরা মাঝে মাঝে রুটি মাংস শাক সবজি প্রভৃতি সহরের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিত। মোরঁৎ ও মেস্ত্রিয়েল নামে দুইজন নাবিক এই কাজে আশ্চর্য্য সাহস ও বাহাদুরি দেখাইয়াছিল। একবার নয় দু'বার নয়, তাহারা বহুদিন ধরিয়া এই রকমে সেই সহরে খাবার জোগাইয়াছিল। ইংরাজেরা তাহাদের ধরিবার জন্য কতবার কত চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারেই তাহারা ইংরাজ জাহাজগুলিকে ফাঁকি দিয়া পলাইত।

এই রকমে ছয় মাস কাটিয়া গেল, তবু দুর্গের লোকেরা দুর্গ ছাড়িয়া দিবার নাম পর্য্যন্ত করে না। তখন রাজা এড্‌ওয়ার্ড কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি আরো লোকজন আনাইয়া সমুদ্রের তীরে দুর্গ বানাইলেন, সেখানে খুব জবরদস্ত পাহারা

বসাইলেন, সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের বড় বড় পাথর ছুঁড়িবার যন্ত্র বসাইলেন। নৌকার সাধ্য কি সে দিক দিয়া সহরে প্রবেশ করে! খাবার আসিবার পথ যখন বন্ধ হইতে চলিল দুর্গের লোকেদেরও তখন হইতে ক্ষুধার কষ্ট আরম্ভ হইল, তাহার দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় তাহাদের মধ্যে নানারকম রোগ দেখা দিতে লাগিল। তবু তাহারা মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া ইংরাজদের শিবির হইতে খাবার কাড়িয়া আনিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাতে যেটুকু খাওয়া জুটিত তাহা অতি সামান্য। দুর্গের সৈন্যেরা মাসের পর মাস ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিয়াও আশ্চর্য্য তেজের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল—তাহাদের এক ভরসা এই যে ফরাসি রাজা ফিলিপ নিশ্চয়ই সৈন্য সামন্ত লইয়া তাহাদের সাহায্য করিতে আসিবেন।

একদিন সত্যসত্যই দেখা গেল সহর হইতে কিছুদূরে ফরাসি সৈন্যদল আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহাদের রঙ্গিন নিশান আর সাদা তাম্বুগুলি দুর্গের লোকেরা যখন দেখিতে পাইল, তখন তাহাদের আনন্দ দেখে কে! তাহারা ভাবিল, আমাদের এত দিনের ক্লেশ সার্থক হইল। যাহা হউক, ফিলিপ আসিয়াই ইংরাজেরা কোথায় কেমন ভাবে আছে, তাহার খবর লইয়া দেখিলেন যে, এখান হইতে ইংরাজদের হঠান বড় সহজ হইবে না। ক্যালে' ঢুকিবার পথ মাত্র দুইটি, একটি একেবারে সমুদ্রের ধারে—সে দিকে ইংরাজের বড় বড় যুদ্ধজাহাজ চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়। আর একটি পথে পোলের উপর দিয়া নদী পার হইতে হয়—সেই পোলের উপর ইরাজেরা রীতিমত দখল জমাইয়া বসিয়াছে। পোলের মুখে দুর্গ বসাইয়া বড় বড় যোদ্ধারা তাহার মধ্যে তীরন্দাজ লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে—তাহারা প্রাণ থাকিতে কেহ পথ ছাড়িবে না। ইহা ছাড়া আর সব জলাভূমি, সেখান দিয়া সৈন্যসামন্ত পার করা এক দুরূহ ব্যাপার।

ফিলিপ তখন ইংরাজ শিবিরে দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব করিলেন, "আইস! তোমরা একবার খোলা ময়দানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর"। এড্‌ওয়ার্ড উত্তর দিলেন, "আমি আজ বৎসর খানেক এইখানে অপেক্ষা করিয়া আছি, ইহাতে আমার খরচ পত্র যথেষ্ট হইয়াছে। এতদিনে দুর্গের লোকেরা কাবু হইয়া আসিয়াছে, এখন তোমার খাতিরে আমি এমন সুযোগ ছাড়িতে প্রস্তুত নই। তোমার রাস্তা তুমি খুঁজিয়া লও।"

তিন দিন ধরিয়া দুই দলে আপোষের কথা বার্ত্তা চলিল, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ মীমাংসা হইল না। তখন ফিলিপ অগত্যা তাঁহার সৈন্যদল লইয়া আবার বিনাযুদ্ধেই ফিরিয়া গেলেন। তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া দুর্গবাসীদের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া

পড়িল। এতদিন তাহারা যে ভরসায় সকল কষ্ট ভুলিয়া ছিল, এখন সে ভরসাও আর রহিল না। তখন তাহারা একেবারে নিরাশ হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল।

এডওয়ার্ড বলিলেন, "সন্ধি করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমরা আমায় বড় ভোগাইয়াছ, আমার অনেক জাহাজ ডুবিয়াছে, টাকা ও সময় নষ্ট হইয়াছে, এবং অন্য নানারকমের ক্ষতি হইয়াছে। আমি ইহার ষোল-আনা শোধ না লইয়া ছাড়িব না। আমার সন্ধির সর্ত্ত এই,—ক্যালের দুর্গ সহর টাকা কড়ি লোকজন সমস্ত আমার হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে—আমার যেমন ইচ্ছা ফাঁসি, কয়েদ, জরিমানা ইত্যাদি দণ্ড বিধান করিব এবং ইহাও জানিও যে আমি যে শাস্তি দিব তাহা বড় সামান্য হইবে না।"

ইংরাজ দূত যখন ক্যালের লোকেদের এই কথা জানাইল, তাহারা এমন সর্ত্তে সন্ধি করিতে রাজি হইল না। তাহারা বলিল, "রাজা এডওয়ার্ড স্বয়ং একজন বীরপুরুষ, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলুন, তিনি এমন অন্যায় দাবী কখন করিবেন না"। ইংরাজদলের ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তখন তাহাদের পক্ষ হইয়া রাজাকে অনেক বুঝাইলেন। ক্যালের লোকেরা কিরূপ সাহসের সহিত কত কষ্ট সহ্য করিয়া বীরের মত দুর্গ রক্ষা করিয়াছে, সে সকল কথা তাঁহারা বার বার বলিলেন। এমন শত্রুকে যে সম্মান করা উচিত একথা একবাক্যে সকলে স্বীকার করিলেন। কিন্তু এডওয়ার্ডের প্রতিজ্ঞা অটল। অনেক বলা কওয়ার পর তিনি একটু নরম হইয়া এই হুকুম দিলেন—"ক্যালের লোকেরা যদি ক্ষমা চায় তবে তাহাদের ছয়জন প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিউক—তাহারা দুর্গের চাবি লইয়া, খালি পায়ে খালি মাথায় গলায় দড়ি দিয়া আমার কাছে আসুক এবং সকলের হইয়া শাস্তি গ্রহণ করুক। তাহা হইলে আর সকলকে মাপ করিতে পারি, কিন্তু এই ছয় জনের আর রক্ষা নাই"।

ইংরাজদূত আবার দুর্গে গিয়া এই হুকুম জানাইল। দুর্গের লোকেরা রাজার আদেশ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতে ছিল—এই হুকুম শুনিয়া তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল। তখন ক্যালের সম্ভ্রান্ত ধনী বৃদ্ধ সেণ্ট্ পিয়ের বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধুগণ, আমার জীবন দিয়া যদি তোমাদের বাঁচাইতে পারি, তবে ইহার চাইতে সুখের মৃত্যু আমি চাহি না। আমি ছয় জনের মধ্যে প্রথম প্রতিনিধিরূপে দাঁড়াইলাম।" এই কথায় চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল—অনেকে সেণ্ট্ পিয়েরের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচজন লোক অগ্রসর হইয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "আমরাও মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি"। এই দৃশ্য

দেখিয়া ইংরাজদূতের চক্ষে জল আসিল—তিনি বলিলেন, "রাজা এড্‌ওয়ার্ড যাহাতে ইঁহাদের প্রতি সদয় হ'ন, আমি সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব"।

ছয়জন প্রতিনিধিকে রাজার সভায় উপস্থিত করা হইল। তাঁহারা শান্তভাবে রাজার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন, তারপর সেণ্টপিয়ের ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের ক্যালে'বাসী বন্ধুগণ এতদিন অসহ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া দুর্গ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদেরই অযোগ্য প্রতিনিধি আমরা আজ তাঁহাদের জীবন রক্ষার জন্য দুর্গের চাবি আপনার কাছে দিতেছি। এখন আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনার ইচ্ছা ও আদেশের অধীন রহিলাম।"

সভাসুদ্ধ লোকে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ছয়জনের সকলেই বয়সে বৃদ্ধ; বহুদিন অনাহারে তাঁহাদের শরীর শুকাইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের গম্ভীর প্রশান্ত মুখে কষ্টের রেখা পড়িয়াছে, এক একজন এত দুর্ব্বল যে চলিতে পা কাঁপে অথচ তাঁহাদের মন এখনও তেজে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের দেখিয়া ইংরাজ যোদ্ধাগণের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, "ইহাদের উপর শাস্তি দিয়া প্রতিশোধ লওয়া কখনই উচিত নয়"। যিনি দূত হইয়া গিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "ইহাদের শাস্তি দিলে রাজা এড্‌ওয়ার্ডের কলঙ্ক হইবে—ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হইবে"। কিন্তু এড্‌ওয়ার্ডের মন গলিল না—তিনি জল্লাদ ডাকিতে হুকুম দিলেন। তখন ইংলণ্ডের রাণী ফিলিপা বন্দীদের মধ্যে কাঁদিয়া

পড়িলেন এবং দুই হাত তুলিয়া ভগবান যীশুর দোহাই দিয়া এডওয়ার্ডকে বলিলেন, "ইহাদের তুমি ছাড়িয়া দাও"। তখন এডওয়ার্ড আর "না" বলিতে পারিলেন না।

ছয় বীরকে মুক্তি দিয়া রাণী তাহাদিগকে তাঁহার নিজের বাড়ীতে লইয়া পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন এবং নানা উপহার দিয়া বিদায় দিলেন। ইঁহাদের বীরত্বের কথা ফরাসিরা আজও ভোলেন নাই—ইংরাজও তাহা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

সাবধান!

আরে আরে ওকি কর প্যালারাম বিশ্বাস!
ফোঁস ফোঁস অত জোরে ফেলনাক নিশ্বাস।
জাননাকি সে বছর ওপাড়ার ভূতোনাথ
নিশ্বেস নিতে গিয়ে হয়েছিল কুপোকাৎ?

হাঁপ ছাড় হাঁসফাঁস ও রকম হাঁ করে।
মুখে যদি ঢুকে বসে পোকা মাছি মাকড়ে?
বিপিনের খুড়ো হয় বুড়ো সেই হল' রায়
মাছি খেয়ে পাঁচমাস ভুগেছিল কলেরায়।
তাই ব'লি, সাবধান! ক'রোনাক ধুপধাপ
টিপিটিপি পায় পায় চলে যাও চুপচাপ।
চেয়োনাক আগে পিছে যেওনাক ডাইনে
সাবধানে বাঁচে লোক,—এই লেখে আইনে।
পড়েছত কথামালা—কে যেন সে কি ক'রে
পথে যেতে পড়েগেল পাতকো'র ভিতরে?
ভাল কথা,—আর যেন ঘোষেদের পুকুরে
নেয়োনাক কোন দিন সকালে কি দুপুরে।
দেখনা পাঁড়েজি সেথা স্নান করে নিত্য
তবুত সারে না তার বায়ু কফ পিত্ত।
এরকম মোটা দেহে কি যে হবে কোন্ দিন
কথাটাকে ভেবে দেখ, কি রকম সঙ্গীন!
চটো কেন? হয় নয় কেবা জানে স্পষ্ট
যদি কিছু হ'য়ে পড়ে পাবে শেষে কষ্ট।
জানি তুমি পণ্ডিত সব কর তুচ্ছ
মহামহোপাধ্যায় গজিয়েছ পুচ্ছ।
মিছি মিছি ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর শুধু তর্ক
শিখেছ জ্যাঠামি খালি ইঁচড়েতে পক্ক।
মানবে না কোন কথা চলাফেরা আহারে
একদিন টের পাবে ঠেলা কয় কাহারে।
রমেশের মেজমামা সেও ছিল সেয়না
যত বলি ভাল কথা কানে কিছু নেয়না—
শেষকালে একদিন চান্নির বাজারে
প'ড়ে গেল গাড়ীচাপা রাস্তার মাঝারে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—

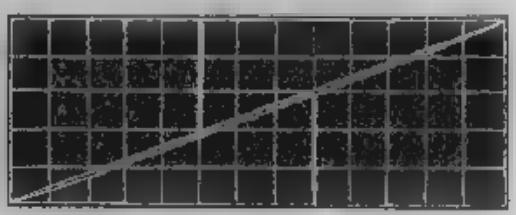

চারটি টুকরা এইরূপে সাজালেই ৬৪ ঘরের জায়গায় ৬৫ ঘর মনে হইবে। (৬৫ ঘর মনে হয় বটে, কিন্তু মাঝে খুব সরু লাইনের মত একটা ফাঁক থাকে। সেই ফাঁকটুকুই একটি ঘরের সমান।)

নূতন ধাঁধা।

১। আছে এক জানোয়ার—চেহারা দেখনি তার ?—
একটারে ল্যাজ কেটে দেখি সে হ'য়েছে চার।

২। দুইটি আকার দেখি তবুও সে নিরাকার
দেখেও দেখিনে তারে চলে ফিরে বারেবার ;
আবার সাকার হ'লে কত স্বাদ পাই রে
টপাটপ মুখে ফেলি মজা ক'রে খাই রে।

৩। আমি বলি 'ঠ্যাং খাও' এই মোর পরিচয়,
সাহসে আপনা মেলি উঠেছি আকাশ ঠেলি
তোমাদেরি ঘরে ঘরে গ্রীষ্মেরে করি জয়।

রাজার বন্ধু।

মিলড্রেড বুক টান ক'রে তাকে উত্তর দিল, "কেন করব না? আমি যে পেল্হাম। পেল্হাম পরিবারের লোকেরা চিরকালই রাজভক্ত, এরা রাজার জন্যে যুদ্ধ করে।"

"রাজার বন্ধু" গল্প দেখ।

BENGAL LIBRARY
1917
WRITERS BUILDINGS

চতুর্থ বর্ষ | পৌষ, ১৩২৩ | নবম সংখ্যা

প্রভাতে।

মধুর প্রভাতে পৃথিবী সাজাতে
বনে ফুটে কত ফুল,
লইবারে মধু আসিয়াছে শুধু—
পিপাসিত অলিকুল।
গিরি হতে নামি যে সাগরগামী
চলেছে সাগর পানে,
সকলের চিত্ত করে আনন্দিত
প্রভাতের কল গানে।
ঘুম ভাঙা আঁখি ডালে বসে পাখী
কি সুমিষ্ট গান গায়,
সোণার বরণ রবির কিরণ
পড়েছে তাহার গায়।
কচি শিশুগুলি, শিখে মিষ্ট বুলি
বসিয়া মায়ের কোলে,
ভাই ভাই ভাই মামা বাবা দাই—
বলে মায় ডাকে ডাকে।

উষার বাতাসে সবে সুখে ভাসে
গাহে শুধু সুখ গান,
সেই গান শুনে অলসের মনে
আসিল নূতন প্রাণ।

শ্রীশতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

নিরেট গুরুর কাহিনী।

ঘোড়ায় চড়ে বাড়ী যাওয়ার গল্প।

সেই লোকটী গুরু শিষ্য সকলকেই আপনার গাঁয়ের বাড়ীতে লইয়া গেল। সে বিশেষ বড়লোক না হইলেও তাহার দান করা অভ্যাস ছিল, কাজেই সে অতিথিদের খুব ভাল করিয়াই খাওয়াইল,—দই, ঘি, দুধ কিছুরই কমতি হইল না। খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া তাহারা মনের আনন্দে পান সুপারী চিবাইতে লাগিল।

তারপর দিন সেই ঘোড়াটাও আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহার মালিক তাহাকে গুরুজীকে দান করিল। ঘোড়াটী বুড়ো ত বটেই, তার উপর আবার তাহার এক চোখ কানা, একটী কান কাটা এবং একটি পা খোঁড়া। এমন গুণের ঘোড়া, গুরু মহাশয়কে খুবই মানাইয়া ছিল, কারণ তাঁহার চেহারাও কতকটা ঐ গোছেরই ছিল। কিন্তু অমন ঘোড়া পাইয়াই গুরু আর তাঁহার চেলারা খুব খুসী হইয়া উঠিল; একে ঘোড়া পাওয়া গেল, তাও বিনা পয়সায়। আনন্দে তাহারা ঘোড়াটার চারিধার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া লাফা-লাফি আরম্ভ করিয়া দিল। কেউ তাহার পা চাপড়ায়, কেউ তাহার পা ধরিয়া টানে, কেউ বা তাহার লেজ ধরিয়া ঝোলে!

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ছেঁড়া, পোকায় কাটা ঘোড়ার সাজ পাওয়া গেল, কিন্তু তার অনেক জায়গা একেবারেই উড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু চেলারা হারিবার পাত্র নয়, যা যা ছিলনা সবই তাহারা অদ্ভুত উপায়ে জোগাড় করিয়া নিল। লাগামটা পাওয়া যাইতে ছিলনা, একজন চেলা মাঠ হইতে এক বোঝা ঘাস ছিঁড়িয়া আনিল, এবং সেইগুলা দড়ি পাকাইয়া চমৎকার লাগাম তৈরী হইয়া গেল। আর যা কিছু বাকী ছিল, তাহা আকাট গাঁয়ের দোকান হইতে কিনিয়া আনিল।

তারপর শুভমুহূর্ত্তে দিনক্ষণ দেখিয়া তাহারা বাহির হইল। তাহাদের যাইবার সময় খুবই ঘটা হইল, সমস্ত গাঁয়ের লোক চেঁচামেচি করিয়া বাহির হইয়া আসিল, কাজেই

গোলমালখানা কিছু কম হইল না। গুরু আগে আগে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন, পিছনে তাঁহার চেলারা জিনিষপত্র ঘাড়ে করিয়া চলিল। কিন্তু আবার এক মুস্কিল হইল, ঘোড়াটা কিছুতেই চলিতে চায় না। পাঁচ চেলায় মিলিয়া তাহাকে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একজন তাহার লাগাম ধরিয়া সামনের দিকে টানিতে লাগিল, আর একজন পিছনে দাঁড়াইয়া ধাক্কা মারিতে লাগিল, দুইজন দুইপাশে দাঁড়াইয়া গুরুর দুই পা ধরিয়া তাঁহাকে সামলাইয়া রাখিল, আর বাকীজন আগে আগে চীৎকার করিয়া চলিল "সাবধান, সাবধান, সরে যাও, সরে যাও"।

এইরকম করিয়া খানিক পথ তাহারা বেশ আনন্দেই চলিল, এবং গাঁয়ের পথ ছাড়াইয়া, বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। বড়রাস্তায় দাঁড়াইয়া একজন লোক মাশুল আদায় করিত, সে অত বড় একদল দেখিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, আসিয়াই ঘোড়াটার জন্য পাঁচ পয়সা মাশুল চাহিয়া বসিল। চেলারা রাগিয়া আগুন। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, "গুরুমশায় চড়ে যাচ্ছেন, এই ঘোড়ার মাশুল পাঁচ পয়সা?

আমরা কি ঘোড়াটাকে বেচতে নিয়ে যাচ্ছি না কিনেছি যে, তুমি মাশুল চাচ্ছ? এটা একজন লোক ওঁকে চড়বার জন্য দিয়েছে।" সে লোকটাও পয়সা না নিয়া ছাড়িবেনা, চেলারাও পয়সা দিবেনা, দুই পক্ষে ঝগড়া করিতে করিতে দুপুর হইয়া গেল। শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া ট্যাঁক হইতে পাঁচ পয়সা বাহির করিয়া, ঘোড়াটাকে মাশুলওয়ালার হাত হইতে উদ্ধার করিল। ঘোড়াটা না থাকিলে আর এই পাঁচ পয়সা খরচ করিতে হইত না এই ভাবিয়া গুরুর দুঃখের সীমা রহিল না।

পথে চলিতে চলিতে তাহারা খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কাছেই একটা সরাই দেখিয়া, একটু বিশ্রাম করিবার জন্য সেইখানে গিয়া উঠিল। গুরু ঘরে ঢুকিয়াই দেখিলেন যে একজন লোক বসিয়া রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার কাছে নিজের দুঃখের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখুন ত মশায়, আমি জন্মে অবধি কখনও ঘোড়ায় চড়িনি, আজ এই প্রথমবার চড়লাম, আর আজই কিনা আমার উপর এমন অত্যাচার! সে যে আমার কাছ থেকে অন্যায় করে পয়সা নিল, এতে কি তার ভাল হবে? আমার বুক ফাটিয়ে যে পয়সা নিয়েছে সে পয়সা আগুন হয়ে তার হাত পুড়িয়ে দেবে"! লোকটি বলিল, "আর মশায় দুঃখ করে কি করবেন? এই হচ্ছে আজকালকার নিয়ম। এখন টাকাই গুরু, টাকাই দেবতা; কথায় বলে, 'টাকার নাম করলে মরা মানুষও হাঁ করে'। টাকা ছাড়া এখন আর কেউ কিছু বোঝে না।" গুরু বলিলেন, "এ কথা ঠিক, টাকা যদি গোবরের মধ্যেও থাকে তা হলেও লোকে সেটা চেটে চেটে বার করবে।"

আজকালকার লোকদের টাকার লোভ সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে দুপুর কাটিয়া গেল, বিকাল বেলায় আবার গুরু ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইলেন এবং রাত্রি হইলে পর একটি গাঁয়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। চেলারা ভাবিল, "ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে কি হবে, বরং ছেড়ে দিলে বেশ সারারাত চরে খাবে"। এই ভাবিয়া তাহারা সেটাকে ছাড়িয়া দিয়া ঘুমাইতে গেল। সকালে উঠিয়া ঘোড়াটাকে আনিতে গিয়া, তাহাকে কিছুতেই খুঁজিয়া পাইল না। অনেক খোঁজাখুঁজি গোলমালের পর জানা গেল যে একজন চাষা সেটাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শুনিয়াই ত সকলে দলবলে সেখানে গিয়া হাজির হইল এবং চাষাকে তাহাদের ঘোড়া ছাড়িয়া দিতে বলিল। সে ত দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "তা আর নয়? সারা রাত ধরে তোমাদের ঘোড়া আমার ফসল খেয়েছে, আর আমি এখন তাকে ছেড়ে দি। আমার জিনিষের দাম দেবে কে"? মহা গোলমাল

লাগিয়া গেল ; গাঁয়ের মোড়ল ছুটিয়া আসিয়া চাষাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে বুঝিবার পাত্রই নয়! কেবলি মাথা নাড়ে আর বলে, "আমার জিনিষের দাম দাও, আমি ঘোড়া ছেড়ে দিচ্ছি, তা না হলে কে ঘোড়া নেয়, আমি দেখব"! ক্রমে ক্রমে গাঁয়ের সব লোক আসিয়া জড় হইল এবং অনেক বকাবকির পর ঠিক হইল যে ঘোড়াটি প্রায় দুই তিন টাকার জিনিষ খাইয়াছে আর নষ্ট করিয়াছে, সুতরাং চাষাকে তিন টাকাই দেওয়া উচিত, তবে গুরু মশায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, আর এ গাঁয়ে অতিথির মত আসিয়াছেন, অতএব এক টাকা দিলেই তাঁহারা ঘোড়া ফিরিয়া পাইবেন। চাষাও এক টাকা লইয়া ঘোড়াটাকে ছাড়িয়া দিল।

ঘোড়াত পাওয়া গেল, কিন্তু এক টাকা খরচ হওয়াতে গুরু খুবই কাতর হইয়া পড়িলেন ; তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, "এ ঘোড়াটা পেয়ে আমার কি লাভ হল ? এটাকে নেওয়ার পর থেকে আমার যে কত টাকা গেল আর কত দুঃখ লাঞ্ছনাই সইতে হল, তার আর লেখা জোখা নেই। এ সব আর আমার বয়সে পোষায় না"। এই বলিয়া তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন। চেলারা যদিও তাঁহাকে অনেক করিয়া ঘোড়ায় উঠিতে বলিল, তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া হাঁটিয়াই চলিলেন। ব্যাপার দেখিয়া চেলারা এবং গাঁয়ের লোকেরা এক জোট হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "আরে মশাই করেন কি, করেন কি ? আপনার বয়সে কি হেঁটে যাওয়া চলে, না সেটা ভাল দেখায়" ? গোলমাল শুনিয়া একজন ভণ্ড দৈবজ্ঞ সেখানে আসিয়া হাজির হইল। সে সব দেখিয়া শুনিয়া বলিল, "মশায় আপনি দুঃখ করবেন না। নিশ্চয়ই ঘোড়াটার ভিতর অনেক পাপ আছে, তাই এ সব কাণ্ড হচ্ছে। তা, আপনারা যদি আমাকে আট নয় আনা পয়সা দেন, তা'হলে আমি ওর সব পাপ খণ্ডিয়ে দিই"। গুরু আর চেলারা পরামর্শ করিয়া দেখিল যে খরচের ভাবনা করিতে গেলে কাজ চলে না ; তখন তাহারা লোকটার হাতে পয়সা দিয়া তাহাকে পাপ দূর করিয়া দিতে বলিল।

লোকটা তখন তাহাদের ঠকাইবার জন্য অনেক রকম বুজরুকী আরম্ভ করিল। সে নানা রকম সুরে যা-তা বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে, ঘাস ছিঁড়িয়া ঘোড়াটার গায়ে ফেলিতে লাগিল, এবং উহার চার পাশে অনেকবার ডিগ্‌বাজী খাইল। শেষে ঘোড়াটাকে আচ্ছা করিয়া চাপড়াইয়া তাহার কাণ ধরিয়া বলিল, "এই কাণের ভিতরই ওর সব পাপ আছে। ইঃ এ ঘোড়াটার দেখছি আগে ভয়ানক পাপ ছিল, একটা কাণ কেটে তবু খানিক কমেছে, এইটা কেটে দিলে একেবারে সব ঠিক হয়ে যাবে"। এই

বলিয়া সে একখানা কাস্তে আনিয়া একটানে ঘোড়ার কাণটা কাটিয়া ফেলিল, এবং তৎক্ষণাৎ সেটা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, পাছে পাপ কাণ হইতে বাহির হইয়া আর কাহারও গায়ে লাগিয়া যায়! পাপ দূর করা দেখিতে অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছিল, কিন্তু পাপ দূর হইবামাত্র ঘোড়াটা চার পা তুলিয়া এমন এক লাফ দিল যে সকলে সেখান হইতে দে ছুট! তারপর সকলে মিলিয়া একটা খুব গভীর গর্ত খুঁড়িয়া, কাণটাকে পুঁতিয়া ফেলিল। এই সব কাজেই দিনটা কাটিয়া গেল, কাজেই সে দিন আর তাহাদের যাওয়া হইল না। তার পর দিন বাহির হইয়া, অনেক কষ্ট ভুগিয়া তাহারা আপনাদের মঠে আসিয়া পৌঁছিল।

"হাইদর।"

গতবারে তোমাদের "কালা"র কথা বলেছি। "কালা", গোরা দেশের জীব হয়েও, দেশের নাম রক্ষা করতে পারেনি, সে 'মিশির' মত, "অমাবস্যা নিশির" মত আর "গদাধরের পিসির" মত কালো; আর "হাইদার", কালো আসিয়ার আরব দেশের জীব হয়েও বর্ণগৌরবে গোরার সমকক্ষ, সে একেবারে দুধের মত সাদা, ঘাড়ের চুল গুলি পর্য্যন্ত কালো নয়, ফিকে হলদে রেশমের মত। সে চুল ইংরাজী রূপসী পেলে গৌরব বোধ করতেন। হাইদরের সঙ্গে আমার পরিচয়ের দীর্ঘ অবসর হয়নি, তবু তার প্রভুর কাছে যা শুনেছিলাম আর নিজে যা দেখেছিলাম তাই তোমাদের জানাব।

মধ্য প্রদেশের একজন কয়দ, প্রায়-স্বাধীন রাজা তার রূপের খ্যাতি আর গুণের প্রশংসা শুনে তাকে বোম্বাই হতে বহুমূল্যে ক্রয় করে এনেছিলেন। তখন তার বয়স সবে চার বৎসর; সেটা ঘোড়ার পক্ষে কিশোর বয়স। রাজার ঘরে এসেও হাইদরের অদৃষ্টে সুখ লেখা ছিলনা, তার কপালের মাঝটিতে আর চার পায়ের গোড়ালিতে চারটি কালো ছাপ ছিল,এতে তাকে দেখতে আরো সুন্দর করেছিল, কিন্তু হলে কি হয়, ঘোড়ার পক্ষে নাকি এমন পঞ্চ তিলক ধারণ সুলক্ষণ নয়। যার এমন থাকে সে 'রাক্ষসগণে'র মত নিকটবন্ধুর প্রাণ হানি করে। ঘোড়া এল, রাজকুমার উৎসাহ করে তাকে অভ্যর্থনা করতে গেলেন, সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতও ছিল; রাজকুমার সুন্দর সুদর্শন অশ্বটিকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হলেন, তাকে যে কি আদরে রাখবেন ভেবেই

পেলেন না। পণ্ডিতজী কিন্তু অশ্বের কৃষ্ণ তিলকগুলি দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন, বল্লেন এ অশ্বকে কখনই অশ্বশালে স্থান দেওয়া হতে পারে না। এ একেবারে মূর্ত্তিমান কৃতান্ত—যে গৃহে প্রবেশ করবে তাকে শ্মশানে পরিণত করে তবে ছাড়বে। রাজকুমার আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত, তিনি বল্লেন "এসব বাজে কথা,—ঘোড়া আমার রাজপুরীর শোভা বর্দ্ধন ছাড়া, কোন হানি করতেই পারে না, আমি একে কিছুতেই ছাড়ছিনে।" কিন্তু তাঁর জিদ বজায় রইল না, রাজমাতা যখন হাইদরের কুলক্ষণের কথা শুনলেন, তখন তাকে রাজপুরীর ত্রিসীমানার মধ্যে রাখা নিষেধ হয়ে গেল। পণ্ডিতের শাস্ত্র-বচন লঙ্ঘন করতে কুমারের দ্বিধা মাত্র হয়নি, কিন্তু মাতৃ আজ্ঞা অবজ্ঞা করবার মত অসৌজন্য তাঁর স্বভাবে ছিল না কাজেই হাইদর নির্ব্বাসিত হয়ে পল্লীর বহুদূরে একটি ভগ্নপ্রায় কুটীরে আশ্রয় লাভ করলে! দিনান্তে অপর্য্যাপ্ত আহার অযত্নে অপরিষ্কৃত স্থানে তার দিন যাপন হ'তে লাগল, পূর্ব্বের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য ক্রমে হ্রাস হয়ে এল।

এই সময়ে রাজ পরিবারে বড় একটি মামলা বহুদিন হতে চলছিল,—রেলওয়ে কোম্পানীর সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ; তখন মধ্য প্রদেশে নতুন রেলের লাইন নির্ম্মান হচ্ছিল। রেলওয়ে কোম্পানীর সঙ্গে ঝগড়া মানে প্রকৃত পক্ষে সরকার বাহাদুরের সঙ্গেই ঝগড়া, সবাই ভীত তটস্থ, মীমাংসা কিছুতেই হচ্ছিল না। তাই যখন যখন রাজকুমারের পাগড়ী ভাই আর রাজমাতার স্নেহ পাত্র নতুন উকীল "বাবু সাহেব" তর্ক, যুক্তি, ও আইনের প্রমাণ প্রয়োগে এ মামলা তাঁদের জিতিয়ে দিলেন তখন রাজপুরী উৎসবময় হয়ে উঠল। উকীল বাবুসাহেব ভালরকম 'ফী'তো পেলেনই, তার উপর পুরস্কারের ব্যবস্থাও হল; মহারাণী নিজে তাঁর দুই হাতে সোণার বালা পরিয়ে দিলেন, আর বাবু সাহেব আরো যা চাইবেন তাই দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। এই বাবু সাহেবটি ঘোড়া বড় ভালবাসতেন, তিনি হাইদারের কাহিনী শুনেছিলেন, আর স্বচক্ষে তার দুরবস্থা দেখে অবধি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছিল। তাই মহারাণী পুরস্কারের কথা বলবামাত্র তিনি ঘোড়াটিকে চেয়ে বস্‌লেন। এ কুলক্ষণ ঘোড়া রাজ্য হতে বিদায় করতে পারলে মহারাণী নিশ্চিন্ত হতে পারতেন সত্য, কিন্তু এই বাবু সাহেবকে তিনি যথার্থ স্নেহ করতেন, নিজ পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় যে জন্তুটিকে দূর করে দিয়েছিলেন, তাকেই আবার অপরের সন্তানকে দেন কি করে, বিশেষ যখন তার আত্মীয় বন্ধু কেউ

কাছে নাই। তবে বাবু সাহের তো ছাড়বার পাত্র নন, মহারাণীও বাকা ভঙ্গ করতে পারেন না, তাই যথাশাস্ত্রবিধি শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে হাইদরকে বিদায় করলেন। "বাবু সাহেব" ঘোড়াটিকে বাড়ী এনে বিশেষ তদ্বির করে আবার সুস্থ সবল করে তুল্লেন। তখন এই অবোলা জীব আর বুদ্ধিজীবি মানুষটির আজীবন বন্ধুত্বের সূচনা হ'ল। হাইদরের বয়স অল্প হ'লেও সে দুষ্ট কিম্বা দুরন্ত ছিল না—ভাল ঘোড়ার সমস্ত সদ্‌গুণই তার ছিল, সে তেজী অথচ শান্ত; পরিশ্রমী এবং প্রভুভক্ত। প্রতিদিন সকালে প্রভুকে পিঠে চড়িয়ে নিয়ে কত দূরে দূরে হাওয়া খাইয়ে আন্‌ত—প্রভুর ইঙ্গিত মাত্র সে প্রশস্ত খাল, সমুচ্চ বেড়া অনায়াসে লাফ দিয়ে পার হয়ে যেত। একবার এই সময়ে ঘোড়ার অত্যধিক বেগ সহ্য করতে না পেরে তার প্রভু পড়ে গিয়ে বিশেষ আঘাত পান, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাহায্য এসে না পৌঁছেছিল, ততক্ষণ হায়দর সেখান হতে এক পাও নড়েনি; স্থির হয়ে তাঁকে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মধ্যদেশে ঘোড়দৌড় খেলায় সে প্রতিবারেই জিতে আস্‌ত, কিন্তু আপন প্রভু ছাড়া আর কাউকে সে সওয়ারি হ'তে দিত না।

একবার 'হাইদরে'র প্রভু পীড়িত হ'ন, চিকিৎসকেরা বল্লেন সমুদ্র-পথে বায়ু পরিবর্ত্তন করে না এলে তাঁর জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন। তিনি একা মানুষ; বহু দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘর দুয়ার অপরের হাতে দিয়ে চলে যেতে হবে, তাই ঘোড়াগুলিকে আপনার একজন ইংরাজ বন্ধুকে বিক্রয় করবেন বলে স্থির করলেন। 'হায়দর'কে পাবার জন্যে সে বন্ধুরও আগ্রহ খুব ছিল, দামের জন্যে আটকাল না, দুর্ম্মূল্য হলেও হাইদরকে তিনি কিন্‌লেন। ঘোড়া যাবার আগেই সাহেব টাকা পাঠিয়ে দিলেন। হাইদরের প্রভুর বিদেশ যাত্রায় সব ঠিক হ'ল; যে রাত্রে রওয়ানা হবেন, সেই দুপুরে হাইদরকে পাঠিয়ে দেবেন স্থির ছিল। হাইদরের প্রভু বারন্দায় একটা ক্যাম্প খাটে শুয়েছিলেন, সাহেবের লোক ঘোড়া নিতে এসেছে শুনে, তিনি বল্লেন নিয়ে যাবার আগে হাইদরকে যেন একবার তাকে দেখিয়ে নিয়ে যায়। নাম ধরে ডাকবামাত্র সে দুচার ধাপ সিড়ি উঠে প্রভুর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল, তার মুখে গলায় হাত বুলিয়ে দেবা মাত্র সে একবার কাতর স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, সে যেন বলে উঠল, "আমার কি দোষে বিদায় করে দিচ্ছ, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না"। তার প্রভুর চোখ জলে ভরে এল—তিনি চিঠি লিখে বন্ধুকে টাকা ফিরিয়ে দিলেন, হাইদরকে আর বিক্রী করা হ'ল না।

আমি যখন তাকে দেখি তখন তার যৌবন কাল অতীত হয়ে গিয়েছিল, তবুও সে তেমনি তেজস্বী আর সুন্দর ছিল। তার মত ঘাড় বাঁকিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে নাচতে নাচতে কোন ঘোড়া যেতে পারত না। এই ঘোড়া আর তার সওয়ারকে দেখ্‌বার জন্য প্রতিদিন পথে জনতা হ'ত। প্রথম যে দিন আমি তার প্রভুর সঙ্গে তাকে আস্তাবলে দেখ্‌তে গেলাম, সেদিন সে আমার সঙ্গে শিষ্টাচার করা দূরে থাকুক, আমাকে খাতিরেই আনলে না। তার প্রভুর স্নেহের আবার একজন অংশীদার জুটেছে এটা তার আদপেই ভাল লাগেনি। আমার দেওয়া রুটি, চিনি বিস্কুট কিছুই সে মুখেই নিত না, এম্নি ভাব করতো যেন আমাকে সে দেখতেই পায়নি। কিন্তু ক্রমে তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গিয়েছিল, তার প্রভু সওয়ারি হতে ফিরে এলে আমি প্রতিদিন তাকে মিষ্টান্ন খাওয়াতাম। মিষ্টির লোভ কয়জন এড়াতে পার বল দেখি! এরি জন্যে পরে সে আমার ডাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে আস্‌ত, আমি মিষ্টি হাতে করে ঘুরে বেড়াতাম সেও আমার পিছে পিছে ঘুরত। আশ্চর্য্য এই, একটি দিনও সে কোন জিনিস উল্টে ফেলেনি, কিম্বা আমায় কোন আঘাত দেয়নি। মিষ্টান্ন খাওয়া হলে তাকে বলতাম, "যা হাইদার চলে যা, আর পাবিনে, লোভী হ'লে মার খাবি"; আর অম্নি সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আপন সহিসের কাছে চলে যেত, যাবার সময় ফিরে ফিরে আমার দিকে চাইত, আর মুখ বাড়াত; ভাবখানা "আমায় আর একটু আদর করো—কাল আবার খেতে পাবত?" কথা কইতে পারত না সত্যি, কিন্তু চোখ দিয়ে সে অনেকই বল্‌ত।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মহাদেব ও হনুমান।

রাবণকে সবংশে বধ করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করিলে পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি রাজা হইলেন। রাবণ ছিল বিশ্রবা মুনির পুত্র—সুতরাং ব্রাহ্মণ। তাহাকে বধ করিয়া রামের ব্রহ্মহত্যা পাপ হইল এবং এই পাপ নষ্ট করিবার জন্য মহামুনি অগস্ত্য তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার উপদেশ দিলেন।

ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার মত সুন্দর সাদা ধপধপে একটি অশ্বের কপালে যজ্ঞকর্ত্তার নাম এবং তাঁহার বলের পরিচয় দিয়া পত্র লিখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। বড়

বড় যোদ্ধারা সৈন্য সামন্ত লইয়া এই যজ্ঞের অশ্ব যেখানে যাইবে তাহার পশ্চাৎ সেইখানে যাইবে। যদি কেহ বলপূর্ব্বক অশ্বটিকে বাঁধিয়া রাখে তবে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এইরূপ সমস্ত রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া অশ্ব ফিরিয়া আসিলে সেই অশ্বদ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হয়। রাম এই অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর শত্রুঘ্ন, ও ভরতের পুত্র পুষ্কল, হনুমান, সুগ্রীব ও অঙ্গদের সহিত কোটি অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্গে লইয়া অশ্বকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহামুনি বশিষ্ঠ সুসজ্জিত যজ্ঞাশ্বের কপালে রামচন্দ্রের নাম এবং তাঁহার বলের পরিচয় দিয়া পত্র লিখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কত রাজার দেশ পার হইয়া অশ্ব চলিল। কেহ বা কেবল রামের নাম শুনিয়াই বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অনেক তেজস্বী ক্ষত্রিয় রাজারা যজ্ঞের অশ্ব ধরিলেন বটে কিন্তু সকলকেই শেষে হার মানিয়া অশ্ব ফিরাইয়া দিতে হইল।

এইরূপে ক্রমে যজ্ঞের অশ্ব দেবপুরে প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা বীরমণির রাজ্যে গিয়া উপস্থিত। রাজা বীরমণি মহাদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং রাজবাড়ীতে থাকিয়া সর্ব্বদা রাজাকে বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিতেন। রাজকুমার রুক্মাঙ্গদ অশ্বটিকে বাঁধিয়া রাজ বাড়ীতে লইয়া আসিলে পর সেই পত্র পড়িয়া বীরমণি জ্বলিয়া উঠিলেন—"কি! অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া রামচন্দ্র সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে বশ করিতে চান—কেন, আমাদের কি শক্তি সামর্থ্য নাই? অশ্ব বাঁধিয়া রাখ, বিনা যুদ্ধে কখনই তাহা ফিরাইয়া দিবনা।" রাজার দূত গিয়া শত্রুঘ্নকে এই সংবাদ জানাইল।

দেখিতে দেখিতে দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রথমে রাজকুমার রুক্মাঙ্গদ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুষ্কলের সহিত সমানে সমানে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পুষ্কলের একটি সাংঘাতিক বাণের আঘাতে রথের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন রাজা বীরমণি ক্রোধে পুষ্কলকে আক্রমণ করিলেন। বীরমণি প্রবীণ যোদ্ধা, পুষ্কল বালক! কিন্তু বালক হইলে কি হয়, ভরতের পুত্র পুষ্কল অসাধারণ যোদ্ধা—আশ্চর্য্য কৌশলে বীরমণির অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া সে একটি ভয়ানক বাণ মারিয়া তাঁহাকেও অজ্ঞান করিয়া ফেলিল।

ভক্তের দুর্গতি দেখিয়া মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহার অনুচর বীরভদ্রকে বলিলেন—, "যাও বীরভদ্র! পুষ্কলের সহিত যুদ্ধ

করিয়া আমার ভক্তের এই অপমানের প্রতিশোধ লও।" পুষ্কলের সহিত বীরভদ্র তখন ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মহাবীর বীরভদ্রের সহিত ক্রমাগত পাঁচদিন ধরিয়া পুষ্কলের যুদ্ধ হইল; বীরভদ্র তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। ষষ্ঠ দিনে মহাদেবের ত্রিশূলের আঘাতে তিনি পুষ্কলের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। শত্রুঘ্নের সৈন্যদলে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল।

শত্রুঘ্ন তখন রাগে দুঃখে পাগলের মত হইয়া একেবারে মহাদেবকেই আক্রমন করিয়া বসিলেন। একদিকে সাক্ষাৎ রামচন্দ্রের মত তেজস্বী মহাবীর শত্রুঘ্ন, অপরদিকে মহাদেব স্বয়ং! সকলের মনে ভয় হইল বুঝি বা প্রলয় কাল উপস্থিত! ক্রমান্বয়ে এগার দিন এই যুদ্ধ হইল। দ্বাদশ দিনে শত্রুঘ্ন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবকে মারিবার জন্য ব্রহ্মশির নামক অতি ভয়ঙ্কর এক অস্ত্র ছাড়িলেন। কিন্তু এই সংঘাতিক অস্ত্রটিকে মহাদেব হাসিতে হাসিতে গিলিয়া ফেলিলেন।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া শত্রুঘ্ন একেবারে অবাক্! তখন কি যে করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে মহাদেব আগুনের মত উজ্জ্বল এক ভীষণ অস্ত্র মারিয়া শত্রুঘ্নকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন।

তখন পবননন্দন হনূমান রাগে আগুন হইয়া মহাদেবের নিকটে গিয়া বলিল—"তুমি নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছ সে জন্য তোমাকে আমি কিছু শাসন করিতে ইচ্ছা করি। মুনি ঋষিদের নিকট চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছি যে প্রভু রামচন্দ্রকে তুমিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি কর। কিন্তু আজ যখন তুমি যুদ্ধ করিয়া আমার প্রভুর ভাই শত্রুঘ্নকে অজ্ঞান করিয়াছ এবং মহাবীর পুষ্কলকে বধ করিয়াছ তখন সে সমস্ত কথাই মিথ্যা—আজ আমি সকলের সাক্ষাতে তোমাকে বধ করিব, তুমি প্রস্তুত হও।"

মহাদেব বলিলেন,—"হনুমান! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ! রামকে আমি বড় দেবতা বলিয়া মানি এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি ইহাও সত্য। কিন্তু বীরমণি আমার পরম ভক্ত—তাহাকে বিপদের সময় রক্ষা না করিয়া ত পারি না।" মহাদেবের কথায় হনুমান রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রকাণ্ড একটা পাথর দিয়া মহাদেবের সারথি, অশ্ব, রথ চুরমার করিয়া দিল। রথহীন হইয়া মহাদেব তাঁহার বাহনে চড়িবা মাত্র হনুমান একটা শালগাছ তুলিয়া লইয়া তাঁহার বুকে গুরুতর এক ঘা বসাইয়া দিল। দারুণ আঘাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তখন মহাদেব ভয়ঙ্কর এক শূল দিয়া হনুমানকে আঘাত করিলেন, হনুমান তাহা দুই হাতে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মহাদেব জ্বলন্ত

এক শক্তি মারিলেন, হনুমান সে আঘাতও অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষ দ্বারা পুনরায় তাঁহার বুকে দারুণ আঘাত করিল—মহাদেবের শরীরের সাপগুলি হনুমানের তাড়নার ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে চারিদিকে পলায়ন করিল।

ইহা দেখিয়া মহাদেব ভীষণ এক মুষল হাতে লইয়া বলিলেন,—"তবেরে বানর! শীঘ্র পলায়ন কর নতুবা এই মুষল দিয়া তোকে আজ বধ করিব।" মহা ক্রোধে মহাদেব মুষল ছাড়িলেন কিন্তু হনুমান রাম নাম স্মরণ করিয়া, এবারেও ফাঁকি দিল। তারপর সে এমন আশ্চর্য্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল যে মহাদেব বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। হনুমান চক্ষের নিমেষে কখনো পাথর ছুঁড়িয়া মারিতেছে কখনো প্রকাণ্ড বড় গাছ লইয়া আঘাত করিতেছে আবার কখনো বা লেজ দিয়া মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিয়া টানাটানি করিতেছে—কোনটা যে তিনি ব্যর্থ করিবেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া মহাদেব বলিলেন,—"বাছা হনুমান! তোমার আশ্চর্য্য বীরত্ব দেখিয়া আমি মহা সন্তুষ্ট হইয়াছি, পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এখন তুমি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া বর প্রার্থনা কর।" মহাদেবকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া হনুমানের বড়ই হাসি পাইল। যাহা হউক তিনি যখন সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তখন আর কথা কি! হনুমান বলিল,—"প্রভু! রঘুনাথের প্রসাদে আমার অভাব কিছুই নাই, তবু আপনি যখন সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিয়াছেন তখন আমি এই প্রার্থনা করি যে যুদ্ধে শত্রুঘ্ন মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, পুষ্কল প্রভৃতি অনেক বড় বড় যোদ্ধারা হত হইয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের শরীর রক্ষা করুন; আপনার ভূত, প্রেতগুলি যেন উঁহাদিগকে খাইয়া না ফেলে; আমি ইত্যবসরে দ্রোণপর্ব্বত হইতে মৃত সঞ্জীবনী ঔষধ লইয়া আসি।" মহাদেব তখন "তথাস্তু" বলিয়া যুদ্ধস্থল রক্ষা করিতে লাগিলেন, হনুমানও দ্রোণপর্ব্বত আনিবার জন্য চলিয়া গেল।

পবননন্দন হনু পবনের ন্যায় বেগে চক্ষের নিমেষে দ্রোণপর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত। পর্ব্বতটিকে জড়াইয়া ধরিয়া টান দিবা মাত্র উহা টলমল করিয়া উঠিল। পর্ব্বত রক্ষক দেবতারা ভাবিলেন—কি সর্ব্বনাশ! পর্ব্বত নড়িতেছে কেন? তাঁহারা সন্ধান করিয়া দেখিলেন বিশাল দেহ মহা ভয়ঙ্কর এক বানর পর্ব্বতকে জোর করিয়া তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। তখন দেবতারা সকলে মিলিয়া হনুমানকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর হনুর নিকট জনকতক রক্ষী দেবতা আর কি, নিমেষ মধ্যে প্রায়

সকলকেই সে যমালয়ে প্রেরণ করিল। দু একজন যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহারা পলায়ন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গিয়া সংবাদ দিলেন। ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া

সমস্ত দেব সৈন্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"যাও, তোমরা শীঘ্র গিয়া এই বানরকে বাঁধিয়া লইয়া আইস।"

অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দেবসৈন্য হনুমানকে গিয়া আক্রমণ করিল, কিন্তু হনুমান তাহাদিগকেও মুহূর্ত্ত মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। এই সংবাদে ভয় পাইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরু! যে বানর দ্রোণপর্ব্বত লইতে আসিয়াছে এবং প্রায় সমস্ত দেবসৈন্যকে যুদ্ধে বধ করিয়াছে সে কে?" বৃহস্পতি বলিলেন—"রাবণকে সবংশে বধ করিয়া যে রাম সীতাকে উদ্ধার করিয়াছেন এই বানর তাঁহারই সেবক—ইহার নাম হনুমান। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন। শিবভক্ত রাজা বীরমণি রামের যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়াছেন বলিয়া সেখানে মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছে। সেই যুদ্ধে স্বয়ং মহাদেব শত্রুঘ্ন এবং পুষ্কল প্রভৃতি রামের অনেক বড় বড় যোদ্ধাকে বধ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য মহাবীর হনুমান দ্রোণপর্ব্বত লইতে আসিয়াছে। দেবরাজ! তুমি শত সহস্র বৎসর যুদ্ধ করিলেও হনুমানকে পরাজয় করিতে পারিবে না, অতএব শীঘ্র গিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট কর।"

বৃহস্পতির কথায় ইন্দ্র মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। হনুমানকে সন্তুষ্ট করিতেই হইবে, কিন্তু দ্রোণপর্ব্বত যদি লইয়া যায় তাহা হইলে দেবতাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা পুনরায় জীবন পাইবেন কি করিয়া? নিরুপায় হইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতিকেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃহস্পতি ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতাদিগকে লইয়া হনুমানের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে মিলিয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিলে পর হনুমান সন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"বীরমণির সহিত যুদ্ধে মহাদেবের হাতে আমাদের বড় বড় যোদ্ধারা অনেকে মারা গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য আমি দ্রোণ পর্ব্বত লইয়া যাইতে আসিয়াছি। হয় আমাকে সেই মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ দাও আর না হয় আমি দ্রোণ পর্ব্বত মাথায় করিয়া লইয়া যাইব। ইহা শুনিয়া দেবতারা সঞ্জীবনী ঔষধ দিয়া হনুমানকে বিদায় করিলেন।

সঞ্জীবনী ঔষধ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়া হনুমান সকলকেই বাঁচাইয়া দিল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

কাঁকড়া-বিছে।

ভাই সন্দেশ,

তোমরা কলকাতায় থাক, বেশ সুখে আছ। আমি থাকি পাড়াগাঁয়ে তাতে পাহাড় পর্ব্বতের মধ্যে। চারিদিকে বন জঙ্গল, রাত্রিতে বাড়ীর আশে পাশে বাঘ ভালুক ঘোরে। আমার বাড়ীর চারিদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা, পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে বাঘ ভালুক আসে না, আর দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে থাকলে কোন ভয় থাকেনা। ভাই, ঘরের মধ্যেও নিস্তার নাই। মেঝেতে ব্যাং থপ্ থপ্ করে যাচ্চে, বাক্সের কোণে সাপ ঢুকচে, ঘরের চাল থেকে রাক্ষুসে মাকড়সা লাফিয়ে পড়ছে, আল্‌নায় জামার ভিতরে, বিছানায় বালিসের তলে, তেঁতুলে বিছে, বইএর আল্‌মারিতে আর জুতোর মধ্যে কাঁকড়াবিছে, কখন যে কোন্‌টা কামড়াবে এই ভয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হয়। ফস্‌করে জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে দেবে, আর জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেবে, আর ঝট্ করে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়বে, সে যো'টি নাই। এ ছাড়া পোকার উৎপাত কত। উই পাখা ধরে পালে পালে ঘরের কোণ থেকে বেরুচ্ছে, বড় বড় সিংওয়ালা গুবরে পোকা ভোঁ করে উড়ে এসে ঠকাস্ করে পড়েছে। গান্ধি পোকা, ছোট গুবরে, সন্ধ্যাফড়িং, ডাল ফড়িং, পাতা ফড়িং কত রং বেরংএর পোকা এসে জ্বালাতন করে।

কাল সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে যাবো বলে চাকরটাকে বুট জুতো ঝোড়া আনতে বল্লাম। পাঁচ সাত দিন এ জুতো পরি নাই, ঘরের এক কোণেই রাখা ছিল। চাকরটা জুতো ঝোড়া বারান্দায় এনে, পোকা টোকা আছে কিনা দেখবার জন্য তাকে উল্টিয়ে মাটীতে ঠুক্‌লে। যেই ঠোকা অমনি প্রকাণ্ড এক কাঁকড়াবিছে—যাকে বলে বৃশ্চিক! না ঝেড়ে যদি তাড়াতাড়ি জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিতাম তা'হলে আমার কি দশাই না হত! বিছের কামড়ের যে কি যাতনা, যে সে কামড় খেয়েছে সেই জানে! তবে নাকি এরা মুখ দিয়ে কামড়ায় না, হুল্ ফুটিয়ে দেয়। তাইতে যন্ত্রণা হয়।

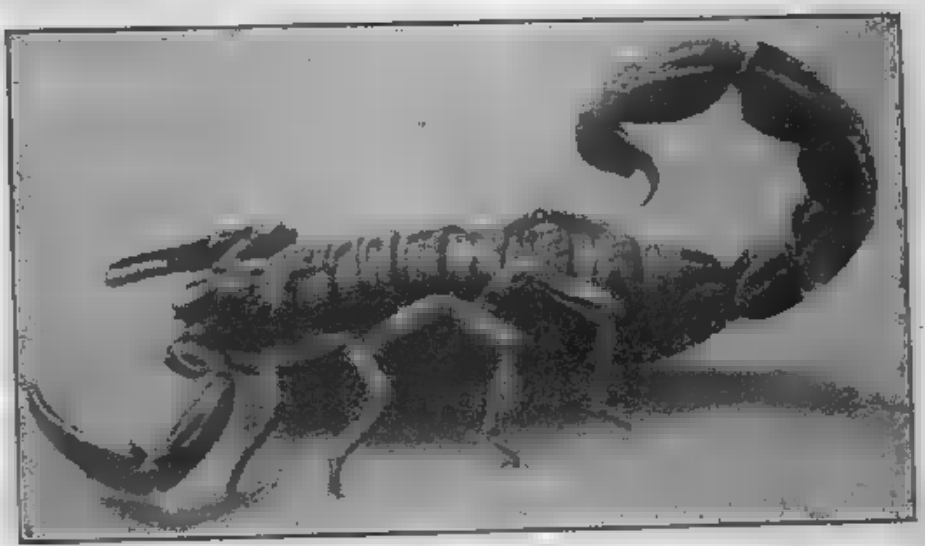

এ বিছাটা মস্ত বড়, রং কাল, গায়ে অল্প অল্প রোম আছে। কাঁকড়ার দাঁড়ার মত বড় বড় এক যোড়া দাঁড়া আছে। জুতো থেকে বেরিয়েই, লেজটা পিঠের উপর উঁচু করে অন্ধকার কোণের দিকে ছুট্। চাকর জানে তার বাবু ওটিকে নেড়ে চেড়ে না দেখে ছাড়বেন না। তাই সে দৌড়িয়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে লোহার বড় চিমটে খানা এনে আমার হাতে দিলে। ওর কাছেও যেতে তার সাহস হল না। আমি চিম্‌টেটা হাতে করে তার কাছে গেলাম। সেটা দেয়ালের কোণেই দাঁড়িয়ে ছিল। যেই চিম্‌টে দিয়ে তাকে ধল্লাম অমনি ফঁস্ ফঁস্ শব্দ কত্তে লাগ্‌ল, আর সাঁড়াসির মত দাঁড়া দিয়ে চিম্‌টেটাকে

চেপে ধরে আর তার লেজ ছুঁড়ে টিমটের গায়ে হুল্ ফোটাতে চেষ্টা কত্তে লাগ্‌ল। আমি তাকে তুলে নিয়ে সেই বড় কাঁচের বোতলের মধ্যে পুরে ফেল্লাম।

এটা খুব মস্ত বিছা। এত বড় বিছা সচারাচর দেখা যায় না। আমি আরো অনেক বিছা মেরেছি। কোনটা লালচে মেটে, কোনটা ধূসর, কোনটা কাল, কিন্তু সে সবগুলিই এর চাইতে ছোট। এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ছোট বড় নানা রকমের কাঁকড়া-বিছে আছে। যে জাতের বিছে ধরেছি সেগুলি সব চাইতে বড় হয়।

মাকড়সার মত এরও মাথা ও বুক মিশে এক হয়েছে। পেটটাতে অনেক ভাগ আছে, পেটের শেষের পাঁচটা ভাগ লম্বা ও সরু হয়ে লেজের মত হয়েছে, আর তার আগায় চিবুলের মত একভাগ আছে, সেইটের আগায় বিড়ালের নখের মত বাঁকা শক্ত ও ছুঁচল হুল্ আছে। এই চিবুলেটায় বিষের থলি আছে, আর ঐ হুলের মধ্যে সরু ছিদ্র আছে। হুল্ ফুটিয়ে দিলে সেই ছিদ্র পথে বিষ বেরিয়ে গায়ে ঢোকে আর তাতেই যন্ত্রণা হয়। মাকড়সার পেট দেখতে একটা খণ্ড, তাতে ভাগ নাই—এদের পেট অনেক ভাগে বিভক্ত, সে ভাগগুলো বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। লেজটাও ওর পেটেরই অংশ।

কাঁকড়া-বিছে মাকড়সার জ্ঞাতি। এর চার যোড়া পা আছে, তা' দিয়ে হাঁটে। সামনের স্পর্শনি যোড়া খুব বড় ও মোটা আর তা দেখ্‌তে কাঁকড়ার দাঁড়ার মত। প্রত্যেকটার আগায় সাঁড়াশির মত দুটা শক্ত আঙ্গুল বা নখ আছে, নখের ভিতর পাশ খাঁজকাটা বা দাঁতযুক্ত। এ দিয়ে শিকার চেপে ধরে, আর তার গায়ে লেজের বাড়ি মেরে হুল্ ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দেয়। সেই বিষে শিকারটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে বা মরে যায়। মুখের সাম্‌নে এক যোড়া ছোট্ট সাঁড়াশির মত আছে। তা দিয়ে খাবার ধ'রে খণ্ড খণ্ড করে আর মুখে পোরে। এরই নীচে ওর ঠোঁট আর মুখের ছিদ্র।

এই দাঁড়ায় আর প্রথম পায়ের গোড়ার দিকে বুকের পাশে কাঁটার মত শক্ত শক্ত লোমের গোছা আছে। বিছা যখন রাগে তখন দাঁড়া যোড়া নড়তে থাকে, তাতে সেই কাঁটাগুলোতে ঘষা লেগে ফস্ ফস্ শব্দ হয়। তোমাদের দাঁত-মাজা শক্ত বুরুষের গায়ে আঙ্গুল টেনে দেখ কেমন শব্দ হয়। এই শব্দও অনেকটা ঐ রকম। এরা ভয় দেখাবার জন্য ঐ রকম শব্দ করে। সতর্ক করে দেয়, যেন বলে, বাপু হে এই বেলা পালাও, কাছে এসো না, এলেই হুল্ ফুটিয়ে দেব।

কাঁকড়া-বিছে যখন হাঁটে তখন লেজটাকে তুলে পিঠের উপর বাঁকিয়ে রেখে চলে। শিকার মারতে হলে তার দিকে হঠাৎ পিছন ফিরে লেজটাকে ঝট্‌করে সোজা ক'রে

তার গায়ে ছুঁড়ে মারে আর অমনি লেজের আগায় সেই বাঁকা [illegible] হুল্‌টা তার গায়ে বিঁধে যায় আর বিষ বেরিয়ে শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়।

এর বিষের ভারি তেজ। মানুষের গায়ে এ বিষ ঢুক্‌লে মানুষ মরে না বটে, কিন্তু এত জ্বালা হয় যে ছট্‌ফট্‌ কত্তে হয়, আর সে যন্ত্রণা অনেকক্ষণ থাকে। কখন কখন দু'তিন দিন পর্য্যন্ত থাকে। সময়ে সময়ে জ্বর হয়, গা বমি বমি করে, মাথা ঘুরোয়, খেতে ইচ্ছে থাকে না। যন্ত্রণা কমে গেলেও তিন চার দিন পর্য্যন্ত শরীর অসুস্থ থাকে। ছোট ছেলেকে খুব বড় বিছায় কামড়ালে, সে মারা পড়ুতেও পারে। এরা মানুষকে খাবে বলে হুল্‌ ফুটোয় না। স্বভাবতঃ এরা ভীরু, মানুষ দেখ্‌লে পালায়। তবে খুব ভয় পেলে আর পালাবার সুবিধা না পেলে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে হুল ফুটিয়ে দেয়।

এরা পাহাড় ও বালীময় শুষ্ক প্রদেশেই বেশী থাকে। খোড়ো ঘরের চালে, দেয়ালের ফাটলে, পাহাড়ের পাথরের ফাঁকে ইট, পাথর, কাঠের তলায় বাস করে। কোন কোন জাত মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়েও তাতে থাকে। এরা দিনের বেলায় ঐ সব যায়গায় লুকিয়ে থাকে। রাত্রিতে শিকারের খোঁজে বাহির হয়। দিন হলেই, কোণা খুঁচিতে যেখানে অন্ধকার পায় সেইখানেই ঢুকে লুকিয়ে থাকে।

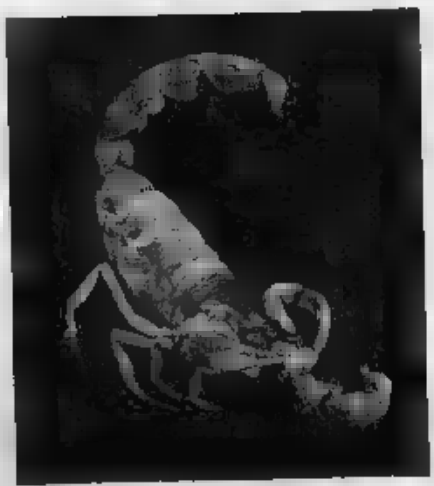

কাঁকড়া-বিছে সাধারণতঃ কীট পতঙ্গ, ও মাকড়সা ধরে খায়। বড় জাতের বিছে ছোট ছোট টিক্‌টিকি, নেংটে ইন্দুর, পাখীর ছোট ছোট বাচ্চাও ধরে খায়। ছোট যে কোন প্রাণীকে ধরে আয়ত্ত করতে পারে তাকেই খায়। এরা একলা একলা থাক্‌তেই ভাল-বাসে। একটা অপরটাকে দেখ্‌লে, দুজনে খুব যুদ্ধ বেধে যায়। যেটা জিতে যায় সেটা অপরটাকে খেয়ে ফেলে।

একটা বিছে আরকটাকে প্রায় খেয়ে ফেলেছে

মাকড়সার মত এরা ডিম পাড়ে না। ডিম মার পেটের ভিতরেই ফোটে, আর জিয়ন্ত পুরো দস্তুর বাচ্চা পেট থেকেই বেরোয়। এক এক বারে অনেকগুলি এমন কি ৫০।৬০টা বাচ্চা জন্মে। ছোট ছোট বাচ্চারা মার পেট থেকে বেরিয়েই মায়ের গায়ে পিঠে চড়ে বসে আর

আঁকড়ে ধরে থাকে। মাসখানেক এই রকম অবস্থায় থাকে। প্রথম খোলস বদলানর পর বাচ্চারা নিজে নিজে খাবার ধরে খায়। বড় না হওয়া পর্য্যন্ত মা বাচ্চাদের তারি

যত্ন করে। আবার সময়ে সময়ে নিজের বাচ্চাদের ধরে ধরে খেয়েও ফেলে।

কাঁকড়া আর মাকড়সার মত বিছাও মাঝে মঝে খোলস বদলায়। দৈবাৎ কোন রকমে একটা পা ছিঁড়ে বা খসে গেলে পরের বারে খোলশ বদলাবার সময়ে নূতন পা গজায়। কাঁকড়া আর মাকড়সাদের নূতন পা গজাবার ক্ষমতা আছে।

পৃথিবীতে অনেক জাতের কাঁকড়া-বিছে আছে। প্রায় সব গরম দেশেই বিছা দেখ্‌তে পাওয়া যায় কেবল টাস্‌মেনিয়া দ্বীপে নাই। অল্প গরমের দেশে, যেমন ইউরোপের দক্ষিণ অংশে, কেবল ছোট রকমের বিছাই দেখা যায়। তারা ২।৩ ইঞ্চির বেশী লম্বা [redacted] না। আর বড় জাতের রাক্ষুসে বিছে কেবল ভারতবর্ষে আর আফ্রিকায় দেখা যায়। এই সব বিছা ৭।৮ ইঞ্চ লম্বা হয়। আমি যেটা ধরেছি সেটা সাত ইঞ্চ লম্বা।

ছবিতে দেখ বিছার কেমন দাঁড়া, কেমন লেজ আর হুল, আর দেখ একটা বিছে কেমন আর একটাকে খাচ্ছে, সবটা খেয়েছে কেবল লেজের আগাটা বেরিয়ে আছে। আরও দেখ মা—রাক্ষুসীটা তা'র ছানাদের ধরে ধরে খাচ্ছে, দুই দাঁড়ায় দু'টো ধরেছে, আর মুখে একটা পুরেছে। কেমন ভায়া এ সব অদ্ভুত কি না?

তোমার মেজ দাদামশায়।

হিপ্পপটেমাসের হাঁ।

এক গ্রাসে এ যত খাবার মুখে পুর্‌তে পারে, পাঁচদিনেও তুমি তা' সাবাড় কর্‌তে পার্‌বে না।

তিমি ছাড়া আর কোন জন্তুই এত বড় হাঁ কর্‌তে পারে না।

রাজার বন্ধু।

প্রায় তিনশ বছর পূর্ব্বেকার কথা বলছি, তখন ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন প্রথম চার্লস্। এই চার্লসের অন্যায় শাসনে ইংলণ্ডের লোকেরা বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। তার ফলে অনেক যুদ্ধ এবং রক্তপাতের পর রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড হয় এবং ওলিভার ক্রমওয়েল্ দেশের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হন। প্রথম চার্লসের বন্ধু বান্ধব যাঁরা তাঁর হয়ে অনেক যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা কিন্তু ওলিভারের শাসন পছন্দ করলেন না। তাঁদের ইচ্ছা রাজকুমার চার্লস্ই ইংলণ্ডের রাজা হয়ে রাজ্য শাসন করেন। এই উপলক্ষে রাজকুমারের দলের সঙ্গে ক্রমওয়েলের ঘোরতর যুদ্ধ বাধে কিন্তু পদে পদে পরাস্ত হয়ে অবশেষে যুবরাজ চার্লস্কে ফ্রান্সে পলায়ন করতে হয়েছিল।

যুবরাজের পলায়নের পর তাঁর যে সব বন্ধু বান্ধব ইংলণ্ডে রইলেন তাঁদের মহা বিপদ উপস্থিত হ'ল। ক্রমওয়েলের হাতে ধরা পড়লে রক্ষা নাই, সুতরাং গোপনে লুকিয়ে থাকা ভিন্ন তখন তাঁদের আর উপায় ছিলনা। এই যে ছোট গল্পটি তোমাদের আজ বলছি এটি পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে যে যুবরাজের বন্ধুরা তখন কিরূপ বিপদে পড়েছিলেন।

যুবরাজের বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন সার রাল্ফ্ পেল্হাম্। সাহসী বীর সার রাল্ফ্ রাজার পক্ষে অনেক যুদ্ধ করে শেষে তাঁর মৃত্যুর পর যুবরাজের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু যুবরাজের পলায়নের পর তাঁর আর কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায়নি। তিনি বেঁচে রইলেন কি যুদ্ধে মারা গেলেন সে সংবাদও কেউ বলতে পারল না। পেল্হাম বংশ খুব সম্ভ্রান্ত ধনীবংশ তাঁদের থাকবার প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, তার নাম 'কেমুর হল'। সার রাল্ফের দুটি সন্তান, বড়টি ছেলে—তার নাম চার্লস্, ছোটটি মেয়ে—কিটি। তাছাড়া সার রাল্ফের ভগ্নী আছেন—আণ্ট্ বেসি। সার্ রাল্ফ্ নিরুদ্দেশ হবার কিছুকাল পরে একদিন শীতের রাত্রিতে তাঁর স্ত্রী লেডি রাল্ফ্ "কেমুর হলে" একটি ঘরে বসেছিলেন। তখন অনেক রাত হয়েছে চার্লস্ আর কিটি ঘুমাতে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আণ্ট্ বেসিও গেছেন। লেডি রাল্ফ্ একলা চুপটি ক'রে আগুনের পাশে বসে স্বামীর কথা ভাবছেন। এমন সময় হঠাৎ বাইরের দরজায় খুব জোরে ঠক্ ঠকানির শব্দ শুনে তিনি চম্কে উঠলেন। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর বৃদ্ধ চাকরটি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘরে এসে উপস্থিত—উৎসাহে আর আনন্দে তার মুখ চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে

উঠেছে। ঘরে ঢুকেই সে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল—"মা ঠাকরুণ! বড় সুখের সংবাদ এনেছি। তার কথা শেষ হতে না হতেই লম্বা চেহারা একটি পুরুষ তাকে ঠেলে সরিয়ে একেবারে লেডি রাল্‌ফের সম্মুখে এসে উপস্থিত। লোকটিকে দেখেই "রাল্‌ফ্!" বলে এক চীৎকার দিয়েই লেডি রাল্‌ফ্ তার দিকে ছুটে গেলেন। ততক্ষনে আণ্ট বেসিও ঘরে এসে উপস্থিত। এতদিন পরে ভাইকে দেখে তাঁর চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল পড়তে লাগল। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেদের ডেকে আনলেন। তখন সকলের আনন্দ আর ধরে না।

রাজকুমারের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে সার রাল্‌ফ্ গুরুতর আঘাত পান। তারপর এতদিন বনের মধ্যে এক গরীব লোকের বাড়ীতে লুকিয়ে থেকে সেই লোকটির যত্নে আরাম হয়েছেন। তখনও তাঁর বিপদ যায়নি, ক্রমওয়েলের লোকেরা তখনও তাঁর সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। তাঁর বাড়ীতেও হয়ত বা তারা এসে উপস্থিত হতে পারে।

তিনি ঘর থেকে বেরুতে যাবেন এমন সময় মহা ব্যস্তসমস্ত হয়ে একজন সৈনিক ঘরে ঢুকে বল্ল—"সার রাল্‌ফ্! এই বেলা পালান, এক মুহূর্ত্তও দেরি করবেন না। ক্রমওয়েলের লোক আপনার পিছু নিয়েছে—ঐ শুনুন তারা এসে পড়ল, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সর্ব্বনাশ! আর উপায় নাই—বাড়ী ঘিরে ফেলেছে।" সার রাল্‌ফ্ মহাব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন "বেসি! আর উপায় নাই, সেই চোরাই পথে এখন লুকিয়ে থাকি গিয়ে।" সেকালের বড়লোকদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই বিপদের সময় লুকাবার জন্য একটা ঘরে গুপ্ত পথ রাখা হতো। আণ্ট বেসি তাড়াতাড়ি সার রালফ্‌কে তাঁর বাড়ীর সেই চোরা পথে লুকিয়ে ফেল্‌লেন। দেখতে দেখতে ক্রমওয়েলের সশস্ত্র সৈনিকদল বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তারা চারদিক খুঁজে এঘর, ওঘর, একোণ সেকোণ, রাস্তা, বাগান কিছুই বাকি রাখল না। ভয়ে সকলের গা কাঁপ্‌তে লাগল—যদি সার রাল্‌ফ্ ধরা পড়ে যান!

প্রায় রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত খুঁজে খুঁজে যখন সার রাল্‌ফ্‌কে পাওয়া গেল না, তখন তাদের দলপতি লেডি রাল্‌ফকে বল্‌লেন—"বিদ্রোহী যে এ বাড়িতেই লুকিয়ে আছে তাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। যা হোক্, আজ রাতটা আমার লোকজন বাড়ী পাহারা দিবে কাল সকালে আমরা আবার সন্ধান করব।"

এদিকে সার রাল্‌ফ্ মৎলব করছেন এখন কি করা যায়। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর গুপ্ত পথের দরজা আস্তে আস্তে একটু খুলে গেল এবং আণ্ট্ বেসি এসে তাঁর কাণে

বল্‌লেন—"একটিও কথা বলোনা, বাড়ীর চারদিকে পাহারা বসেছে—কাল আর তোমার পালাবার উপায় থাক্‌বে না, তোমাকে এখনি পালাতে হবে।"

পালাবার আগে ছেলেমেয়েদের এবং স্ত্রীকে শেষ দেখা একবার না দেখে সার রালফ্ কিছুতেই যেতে রাজি হলেন না। আণ্ট্ বেসি তাতে অনেক আপত্তি করলেন বটে কিন্তু কিছুতেই তিনি যখন মানলেন না তখন চোরের মত হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে দুজনে ছেলেদের ঘরে গেলেন। সেখানে তখন লেডি রালফ্‌ও ছিলেন। আণ্ট্ বেসি বল্‌লেন—"কিটি! চার্লস্! তোমরা চুপটি করে থাক কান্না কাটি করো না। বাবা বাড়ী এসেছেন বটে কিন্তু এখনি আবার তাঁকে চলে যেতে হবে।"

দৃঢ়চিত্ত সার রালফেরও তখন চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, তিনি ছেলে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কিটি তাঁর গলায় ধরে কত মিনতি করে বল্ল—"বাবা! তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেওনা।" কিন্তু সার রালফ্ কি না গিয়ে পারেন! তিনি মেয়েকে বল্লেন,—"আমাকে যেতেই হবে মা। এখানে থাক্‌লে আমার অনিষ্ট হবে। লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাক, আমি যতদিন ফিরে না আসি মাকে সুখী করতে চেষ্টা করো।"

চার্লস্ ততক্ষণে সমস্ত ব্যাপার বুঝ্‌তে পেরেছে। সে জিজ্ঞাসা করল—"বাবা! ওরা কি তোমাকে ধরে নেবে বলে এখানে এসেছে?

সার রালফ্ বল্লেন—"হাঁ বাবা, তুমি ঠিকই বলেছ। যাহোক্ এখন ও ব কথা তুমি বুঝতে পারবে না। যাবার সময় একটি কথা তোমাকে বলে যাচ্ছি—বিশেষ করে সর্ব্বদা মনে রেখো যে তুমি সম্ভ্রান্ত বংশের এবং ভদ্র-ঘরের ছেলে আর তোমার বাবা শেষ পর্য্যন্ত রাজার খুব বন্ধু ছিলেন। সকল অবস্থায় এই কথাই স্মরণ করো—পেলহাম্ পরিবারের সকলে ধার্ম্মিক এবং রাজভক্ত। আমি যদি আর কখন ফিরে না আসি, আমার কথাগুলি ভুলে যেও না—চিরজীবন সাহসী, সত্যবাদী থেকে রাজার সেবায় প্রাণ দেবে। ভয় কি! আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি যুবরাজ চার্লস্ শীঘ্রই ইংলণ্ডের রাজা হবেন।"

সার রালফ্ সকলের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে আবার গুপ্তপথে ফিরে চল্লেন। সে পথ দিয়ে গভীর বনে যাওয়া যায়। একবার সে বনে প্রবেশ করতে পারলে আর ভাবনা কি? ক্রম্‌ওয়েলের সৈন্যেরা তাঁর কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না।

সে রাত্রি আণ্ট্ বেসি আর লেডি রালফ্ আর ঘুমাতে পারলেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেল, ক্রমে রাত্রি প্রভাত হলো; তখন তাঁরাও এই ভেবে, মনকে সান্ত্বনা দিলেন যে সার রালফ্ নিরাপদে বনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছুতে পেরেছেন।